প্রবন্ধ

বিচিত্র প্রবন্ধ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

BENGALIEBOOK.COM
2021

সূচিপত্র

- লাইব্রেরি 2
- মা ভৈঃ 5
- পাগল 10
- রঙ্গমঞ্চ 16
- কেকাধ্বনি 22
- বাজে কথা 27
- পনেরো- আনা 31
- নববর্ষা 36
- পরনিন্দা 42
- বসন্তযাপন 47
- রুদ্ধ গৃহ 52
- পথপ্রান্তে 55
- ছোটোনাগপুর 60
- সরোজিনী- প্রয়াণ 65

লাইব্রেরি

মহাসমুদ্রের শত বৎসরের কল্লোল কেহ যদি এমন করিয়া বাঁধিয়া রাখিতে পারিত যে, সে ঘুমাইয়া পড়া শিশুটির মতো চুপ করিয়া থাকিত, তবে সেই নীরব মহাশব্দের সহিত এই লাইব্রেরির তুলনা হইত। এখানে ভাষা চুপ করিয়া আছে, প্রবাহ স্থির হইয়া আছে, মানবাত্মার অমর আলোক কালো অক্ষরের শৃঙ্খলে কাগজের কারাগারে বাঁধা পড়িয়া আছে। ইহারা সহসা যদি বিদ্রোহী হইয়া উঠে, নিস্তব্ধতা ভাঙিয়া ফেলে, অক্ষরের বেড়া দগ্ধ করিয়া একেবারে বাহির হইয়া আসে! হিমালয়ের মাথার উপরে কঠিন বরফের মধ্যে যেমন কত কত বন্যা বাঁধা আছে, তেমনি এই লাইব্রেরির মধ্যে মানবহৃদয়ের বন্যা কে বাঁধিয়া রাখিয়াছে!

বিদ্যুৎকে মানুষ লোহার তার দিয়া বাঁধিয়াছে, কিন্তু কে জানিত মানুষ শব্দকে নিঃশব্দের মধ্যে বাঁধিতে পারিবে। কে জানিত সংগীতকে, হৃদয়ের আশাকে, জাগ্রত আত্মার আনন্দধ্বনিকে, আকাশের দৈববাণীকে সে কাগজে মুড়িয়া রাখিবে। কে জানিত মানুষ অতীতকে বর্তমানে বন্দী করিবে। অতলস্পর্শ কালসমুদ্রের উপর কেবল এক-একখানি বই দিয়া সাঁকো বাঁধিয়া দিবে।

লাইব্রেরির মধ্যে আমরা সহস্র পথের চৌমাথার উপরে দাঁড়াইয়া আছি। কোনো পথ অনন্ত সমুদ্রে গিয়াছে, কোনো পথ অনন্ত শিখরে উঠিয়াছে, কোনো পথ মানব-হৃদয়ের অতল স্পর্শে নামিয়াছে। যে যে দিকে ইচ্ছা ধাবমান হও, কোথাও বাধা পাইবে না। মানুষ আপনার পরিত্রাণকে এতটুকু জায়গার মধ্যে বাঁধাইয়া রাখিয়াছে।

শঙ্খের মধ্যে যেমন সমুদ্রের শব্দ শুনা যায় তেমনি এই লাইব্রেরির মধ্যে কি হৃদয়ের উত্থান-পতনের শব্দ শুনিতেছ? এখানে জীবিত ও মৃত ব্যক্তির হৃদয় পাশাপাশি এক পাড়ায় বাস করিতেছে। বাদ ও প্রতিবাদ এখানে দুই ভাইয়ের মতো একসঙ্গ থাকে। সংশয় ও বিশ্বাস, সন্ধান ও আবিষ্কার এখানে দেহে দেহে লগ্ন হইয়া বাস করে। এখানে দীর্ঘপ্রাণ ও স্বল্পপ্রাণ পরম ধৈর্য ও শান্তির সহিত জীবনযাত্রা নির্বাহ করিতেছে, কেহ কাহাকেও উপেক্ষা করিতেছে না।

কত নদী সমুদ্র পর্বত উল্লঙ্ঘন করিয়া মানবের কণ্ঠ এখানে আসিয়া পৌঁছিয়াছে কত শত বৎসরের প্রান্ত হইতে এই স্বর আসিতেছে। এসো এখানে এসো, এখানে আলোকের জন্ম সংগীত গান হইতেছে।

অমৃতলোক প্রথম আবিষ্কার করিয়া যে যে মহাপুরুষ যে-কোনোদিন আপনার চারি দিকে মানুষকে ডাক দিয়া বলিয়াছিলেন তোমরা সকলে অমৃতের পুত্র, তোমরা দিব্যধামে বাস করিতেছ, সেই মহাপুরুষদের কণ্ঠই সহস্র ভাষায় সহস্র বৎসরের মধ্য দিয়া এই লাইব্রেরির মধ্যে প্রতিধ্বনিত হইতেছে।

এই বঙ্গের প্রান্ত হইতে আমাদের কি কিছু বলিবার নাই? মানবসমাজকে আমাদের কি কোনো সংবাদ দিবার নাই? জগতের একতান সংগীতের মধ্যে বঙ্গদেশই কেবল নিস্তব্ধ হইয়া থাকিবে!

আমাদের পদপ্রান্তস্থিত সমুদ্র কি আমাদিগকে কিছু বলিতেছে না? আমাদের গঙ্গা কি হিমালয়ের শিখর হইতে কৈলাসের কোনো গান বহন করিয়া আনিতেছে না? আমাদের মাথার উপরে কি তবে অনন্ত নীলাকাশ নাই? সেখান হইতে অনন্তকালের চিরজ্যোতির্ময়ী নক্ষত্রলিপি কি কেহ মুছিয়া ফেলিয়াছে?

দেশ-বিদেশ হইতে, অতীত-বর্তমান হইতে প্রতিদিন আমাদের কাছে মানবজাতির পত্র আসিতেছে; আমরা কি তাহার উত্তরে দুটি-চারটি চটি চটি ইংরেজি খবরের কাগজ লিখিব! সকল দেশ অসীম কালের পটে নিজ নিজ নাম খুদিতেছে, বাঙালির নাম কি কেবল দরখাস্তের দ্বিতীয় পাতেই লেখা থাকবে! জড় অদৃষ্টের সহিত মানবাত্মার সংগ্রাম চলিতেছে, সৈনিকদিগকে আহ্বান করিয়া পৃথিবীর দিকে দিকে শৃঙ্গধ্বনি বাজিয়া উঠিয়াছে, আমরা কি কেবল আমাদের উঠানের মাচার উপরকার লাউ কুমড়া লইয়া মকদ্দমা এবং আপীল চালাইতে থাকিব!

বহু বৎসর নীরব থাকিয়া বঙ্গদেশের প্রাণ ভরিয়া উঠিয়াছে। তাহাকে আপনার ভাষায় একবার আপনার কথাটি বলিতে দাও। বাঙালি-কণ্ঠের সহিত মিলিয়া বিশ্বসংগীত মধুরতর হইয়া উঠিবে।

পৌষ, ১২৯২

মা ভৈঃ

মৃত্যু একটা প্রকাণ্ড কালো কঠিন কষ্টিপাথরের মতো। ইহারই গায়ে কষিয়া সংসারের সমস্ত খাঁটি সোনার পরীক্ষা হইয়া থাকে।

তুমি দেশকে যথার্থ ভালবাস, তাহার চরম পরীক্ষা তুমি দেশের জন্য মরিতে পার কি না। তুমি আপনাকে যথার্থ ভালবাস, তাহারও চরম পরীক্ষা আপনার উন্নতির জন্য প্রাণ বিসর্জন করা তোমার পক্ষে সম্ভবপর কি না।

এমন একটা বিশ্বব্যাপী সার্বজনীন ভয় পৃথিবীর মাথার উপর যদি না ঝুলিত, তবে সত্য-মিথ্যাকে, ছোটো-বড়-মাঝারিকে বিশুদ্ধভাবে তুলা করিয়া দেখিবার কোনো উপায় থাকিত না।

এই মৃত্যুর তুলায় যে সব জাতির তৌল হইয়া গেছে তাহারা পাস-মার্কা পাইয়াছে। তাহারা আপনাদিগকে প্রমাণ করিয়াছে, নিজের কাছে ও পরের কাছে তাহাদের আর কিছুতেই কুণ্ঠিত হইবার কোনো কারণ নাই। মৃত্যুর দ্বারাই তাহাদের জীবন পরীক্ষিত হইয়া গেছে। ধনীর যথার্থ পরীক্ষা দানে; যাহার প্রাণ আছে তাহার যথার্থ পরীক্ষা প্রাণ দিবার শক্তিতে। যাহার প্রাণ নাই বলিলেই হয় সে-ই মরিতে কৃপণতা করে।

যে মরিতে জানে সুখের অধিকার তাহারই; যে জয় করে ভোগ করা তাহাকেই সাজে। যে লোক জীবনের সঙ্গ সুখকে বিলাসকে দুই হাতে আঁকড়িয়া থাকে, সুখ তাহার সেই ঘৃণিত ক্রীতদাসের কাছে নিজের সমস্ত ভাণ্ডার খুলিয়া দেয় না; তাহাকে উচ্ছিষ্টমাত্র দিয়া দ্বারে ফেলিয়া রাখে। আর মৃত্যুর আহ্বানমাত্র যাহারা তুড়ি মাড়িয়া চলিয়া যায়, চির-আদৃত সুখের দিকে একবার পিছন ফিরিয়া তাকায় না, সুখ তাহাদিগকে চায়, সুখ তাহারাই জানে। যাহারা সবলে ত্যাগ করিতে পারে তাহারাই প্রবলভাবে ভোগ করিতে পারে। যাহারা মরিতে জানে না তাহাদের ভোগবিলাসের দীনতা-কৃশতা-ঘৃণ্যতা গাড়িজুড়ি এবং তকমা-চাপরাসের দ্বারা

সূচিপত্র

ঢাকা পড়ে না। ত্যাগের বিলাসবিরল কঠোরতার মধ্যে পৌরুষ আছে, যদি স্বেচ্ছায় তাহা বরণ করি তবে নিজেকে লজ্জা হইতে বাঁচাইতে পারিব।

এই দুই রাস্তা আছে–এক ক্ষত্রিয়ের রাস্তা, আর-এক ব্রাহ্মণের রাস্তা। যাহারা মৃত্যুভয়কে উপেক্ষা করে পৃথিবীর সুখসম্পদ তাহাদেরই। যাহারা জীবনের সুখকে অগ্রাহ্য করিতে পারে তাহাদের আনন্দ মুক্তির। এই দুয়েতেই পৌরুষ।

“প্রাণটা দিব’ এ কথা বলা যেমন শক্ত-“সুখটা চাই না’ এ কথা বলা তাহা অপেক্ষা কম শক্ত নয়। পৃথিবীতে যদি মনুষ্যত্বের গৌরবে মাথা তুলিয়া চলিতে চাই তবে এই দুয়ের একটা কথা যেন বলিতে পারি। হয় বীর্যের সঙ্গ বলিতে হইবে “চাই’, নয় বীর্যের সঙ্গ বলিতে হইবে “চাই না’। “চাই’ বলিয়া কাঁদিব, অথচ লইবার শক্তি নাই; “চাই না’ বলিয়া পড়িয়া থাকিব; কারণ চাহিবার উদ্যম নাই–এমন ধিক্কার বহন করিয়াও যাহারা বাঁচে যম তাহাদিগকে নিজগুণে দয়া করিয়া না সরাইয়া লইলে তাহাদের মরণের আর উপায় নাই ।

বাঙালী আজকাল লোকসমাজে বাহির হইয়াছে। মুশকিল এই যে, জগতের মৃত্যুশালা হইতে তাহার কোনো পাস নাই। সুতরাং তাহার কথাবার্তা যতই বড়ো হোক, কাহারো কাছে সে খাতির দাবি করিতে পারে না। এইজন্য তাহার আস্ফালনের কথায় অত্যন্ত বেসুর এবং নাকিসুর লাগে। না মরিলে সেটার সংশোধন হওয়া শক্ত।

পিতামহের বিরুদ্ধে আমাদের এইটেই সব চেয়ে বড়ো অভিযোগ। সেই তো আজ তাঁহারা নাই, তবে ভালোমন্দ কোনো-একটা অবসরে তাঁহারা রীতিমত মরিলেন না কেন? তাঁহারা যদি মরিতেন তবে উত্তরাধিকারসূত্রে আমরাও নিজেদের মরিবার শক্তি সম্বন্ধে আস্থা রাখিতে পারিতাম। তাঁহারাও নিজে না খাইয়াও ছেলেদের অন্নের সংগতি রাখিয়া গেছেন, শুধু মৃত্যুর সংগতি রাখিয়া যান নাই। এত বড়ো দুর্ভাগ্য, এত বড়ো দীনতা আর কী হইতে পারে।

ইংরেজ আমাদের দেশের যোদ্ধজাতিকে ডাকিয়া বলেন, “তোমরা লড়াই করিয়াছ, প্রাণ দিতে জান; যাহারা কখনো লড়াই করে না, কেবল বকিতে জানে, তাহাদের দলে ভিড়িয়া তোমরা কন্‌গ্রেস করিতে যাইবে!’

তর্ক করিয়া ইহার উত্তর দেওয়া যাইতে পারে। কিন্তু তর্কের দ্বারা লজ্জা যায় না । বিশ্বকর্মা নৈয়ায়িক ছিলেন না, সেইজন্য পৃথিবীতে অযৌক্তিক ব্যাপার পদে পদে দেখিতে পাওয়া যায়। সেইজন্য, যাহারা মরিতে জানে না, তাহারা শুধু যুদ্ধের সময়ে নহে, শান্তির সময়েও পরস্পর ঠিক সমানভাবে মিশিতে পারে না। যুক্তিশাস্ত্রে ইহা অসংগত, অর্থহীন, কিন্তু পৃথিবীতে ইহা সত্য।

অতএব, আরাম-কেদারায় হেলান দিয়া পোলিটিকাল সুখস্বপ্নে যখন কল্পনা করি “সমস্ত-ভারতবর্ষ এক হইয়া মিশিয়া যাইতেছে’, তখন মাঝখানে এই একটা দুশ্চিন্তা উঠে যে, বাঙালির সঙ্গ শিখ আপন ভাইয়ের মতো মিশিবে কেন? বাঙালি বি।এ। এবং এম।এ।পরীক্ষায় পাস হইয়াছে বলিয়া? কিন্তু যখন তাহার চেয়ে কড়া পরীক্ষার কথা উঠিবে তখন সার্টিফিকেট বাহির করিব কোথা হইতে? শুদ্ধমাত্র কথায় অনেক কাজ হয়, কিন্তু সকলেই জানেন চিঁড়ে ভিজাইবার সময় কথা দধির স্থান অধিকার করিতে পারে না; তেমনি যেখানে রক্তের প্রয়োজন সেখানে বিশুদ্ধ কথা তাহার অভাব পূরণ করিতে অশক্ত।

অথচ যখন ভাবিয়া দেখি আমাদের পিতামহীরা স্বামীর সহিত সহমরণে মরিয়াছেন, তখন আশা হয়–মরাটা তেমন কঠিন হইবে না। অবশ্য, তাঁহারা সকলেই স্বেচ্ছাপূর্বক মরেন নাই। কিন্তু অনেকেই যে মৃত্যুকে স্বেচ্ছাপূর্বক বরণ করিয়াছেন, বিদেশীরাও তাহার সাক্ষ্য দিয়াছেন।

কোনো দেশেই লোকনির্বিশেষে নির্ভয়ে ও স্বেচ্ছায় মরে না। কেবল স্বল্প একদল মৃত্যুকে যথার্থভাবে বরণ করিতে পারে–বাকি সকলে কেহ বা দলে ভিড়িয়া মরে, কেহ বা লজ্জায় পড়িয়া মরে, কেহ বা দস্তুরের তাড়নায় জড়ভাবে মরে।

মন হইতে ভয় একেবারে যায় না। কিন্তু ভয় পাইতে নিজের কাছে ও পরের কাছে লজ্জা করা চাই। শিশুকাল হইতে ছেলেদের এমন শিক্ষা দেওয়া উচিত, যাহাতে ভয় পাইলেই তাহারা অনায়াসে অকপটে স্বীকার না করিতে পারে। এমন শিক্ষা পাইলে লোকে লজ্জায় পড়িয়া সাহস করে। যদি মিথ্যা গর্ব করিতে হয় তবে “আমার সাহস আছে’ এই মিথ্যা গর্বই সব চেয়ে মার্জনীয়। কারণ, দৈন্যই বলো, অজ্ঞতাই বলো, মূঢ়তাই বলো, মনুষ্যচরিত্রে ভয়ের মতো এত ছোটো আর কিছুই নাই। ভয় নাই বলিয়া যে লোক মিথ্যা অহংকারও করে, অন্তত তাহার লজ্জা আছে এ সদ্‌গুণটারও প্রমাণ হয়।

নির্ভীকতা যেখানে নাই, সেখানে এই লজ্জার চর্চা করিলেও কাজে লাগে। সাহসের ন্যায় লজ্জাও লোককে বল দেয়। লোকলজ্জায় প্রাণবিসর্জন করা কিছুই অসম্ভব নয়।

অতএব আমাদের পিতামহীরা কেহ কেহ লোকলজ্জাতেও প্রাণ দিয়াছিলেন, এ কথা স্বীকার করা যাইতে পারে। প্রাণ দিবার শক্তি তাঁহাদের ছিল–লজ্জায় হোক, প্রেমে হোক, ধর্মোৎসাহে হোক, প্রাণ তাঁহারা দিয়াছিলেন, এ কথা আমাদিগকে মনে রাখিতে হইবে।

বস্তুত দল বাঁধিয়া মরা সহজ। একাকিনী চিতাগ্নিতে আরোহণ করিবার মতো বীরত্ব যুদ্ধক্ষেত্রে বিরল।

বাংলার সেই প্রাণবিসর্জনপরায়ণা পিতামহীকে আজ আমরা প্রণাম করি। তিনি যে জাতিকে স্তন দিয়াছেন, স্বর্গে গিয়া তাহাকে বিস্মৃত হইবেন না। হে আর্যে, তুমি তোমার সন্তানদিগকে সংসারে চরম ভয় হইতে উত্তীর্ণ করিয়া দাও। তুমি কখনো স্বপ্নেও জান নাই যে, তোমার আত্মবিস্মৃত বীরত্ব-দ্বারা তুমি পৃথিবীর বীরপুরুষদিগকেও লজ্জিত করিতেছ। তুমি যেমন দিবাবসানে সংসারের কাজ শেষ করিয়া নিঃশব্দে পতির পালঙ্ক আরোহণ করিতে দাম্পত্যলীলার অবসানদিনে সংসারের কার্যক্ষেত্র হইতে বিদায় লইয়া তুমি তেমনি সহজে বধূবেশে সীমন্তে

মঙ্গল-সিন্দুর পরিয়া পতির চিতায় আরোহণ করিয়াছ। মৃত্যুকে তুমি সুন্দর করিয়াছ, শুভ করিয়াছ, পবিত্র করিয়াছ–চিতাকে তুমি বিবাহশয্যার ন্যায় আনন্দময় কল্যাণময় করিয়াছ। বাংলাদেশে পাবক তোমারই পবিত্র জীবনাহুতি-দ্বারা পূত হইয়াছে–আজ হইতে এই কথা আমরা স্মরণ করিব। আমাদের ইতিহাস নীরব, কিন্তু অগ্নি আমাদের ঘরে ঘরে তোমার বাণী বহন করিতেছে। তোমার অক্ষয় অমর স্মরণনিলয় বলিয়া সেই অগ্নিকে, তোমার সেই অন্তিমবিবাহের জ্যোতিঃসূত্রময় অনন্ত পট্টবসন-খানিকে,আমরা প্রত্যহ প্রণাম করিব। সেই অগ্নিশিখা তোমার উদ্যত বাহুরূপে আমাদের প্রত্যেককে আশীর্বাদ করুক। মৃত্যু যে কত সহজ, কত উজ্জ্বল, কত উন্নত, হে চিরনীরবস্বর্গবাসিনী, অগ্নি আমাদের গৃহ প্রাঙ্গণে তোমার নিকট হইতে সেই বার্তা বহন করিয়া অভয় ঘোষণা করুক।

কার্তিক, ১৩০৯

পাগল

পশ্চিমের একটি ছোটো শহর। সম্মুখে বড়ো রাস্তার পরপ্রান্তে খোড়ো চালগুলার উপরে পাঁচ-ছয়টা তালগাছ বোবার ইঙ্গিতের মতো আকাশে উঠিয়াছে, এবং পোড়ো বাড়ির ধারে প্রাচীন তেঁতুল গাছ তাহার লঘুচিক্কণ ঘন পল্লবভার সবুজ মেঘের মতো স্তূপে স্তূপে স্ফীত করিয়া রহিয়াছে। চালশূন্য ভামা ভিটার উপরে ছাগ-ছানা চরিতেছে। পশ্চাতে মধ্যাহ্ন-আকাশের দিগন্তরেখা পর্যন্ত বনশ্রেণীর শ্যামলতা।

আজ এই শহরটির মাথার উপর হইতে বর্ষা হঠাৎ তাহার কালো অবগুণ্ঠন একেবারে অপসারিত করিয়া দিয়াছে।

আমার অনেক জরুরি লেখা পড়িয়া আছে-তাহারা পড়িয়াই রহিল। জানি, তাহা ভবিষ্যতে পরিতাপের কারণ হইবে; তা হউক, সেটুকু স্বীকার করিয়া লইতে হইবে। পূর্ণতা কোন্ মূর্তি ধরিয়া হঠাৎ কখন আপনার আভাস দিয়া যায় তাহা তো আগে হইতে কেহ জানিয়া প্রস্তুত হইয়া থাকিতে পারে না, কিন্তু যখন সে দেখা দিল তখন তাহাকে শুধু-হাতে অভ্যর্থনা করা যায় না। তখন লাভক্ষতির আলোচনা যে করিতে পারে সে খুব হিসাবি লোক, সংসারে তাহার উন্নতি হইতে থাকিবে, কিন্তু হে নিবিড় আষাঢ়ের মাঝখানে একদিনের জ্যোতির্ময় অবকাশ, তোমার শুভ্রমেঘমাল্যখচিত ক্ষণিক অভ্যুদয়ের কাছে আমার সমস্ত জরুরি কাজ আমি মাটি করিলাম–আজ আমি ভবিষ্যতের হিসাব করিলাম না–আজ আমি বর্তমানের কাছে বিকাইলাম।

দিনের পর দিন আসে, আমার কাছে তাহারা কিছুই দাবি করে না; তখন হিসাবের অঙ্ক ভুল হয় না, তখন সকল কাজই সহজে করা যায়। জীবনটা তখন এক দিনের সঙ্গ আর-এক দিন, এক কাজের সঙ্গ আর-এক কাজ দিব্য গাঁথিয়া-গাঁথিয়া অগ্রসর হয়; সমস্ত বেশ সমানভাবে চলিতে থাকে। কিন্তু হঠাৎ কোনো খবর না দিয়া একটা বিশেষ দিন সাত-সমুদ্র-পারের রাজপুত্রের মতো আসিয়া উপস্থিত হয়, প্রতিদিনের

সূচিপত্র

সঙ্গ তাহার কোনো মিল হয় না, তখন মুহূর্তের মধ্যে এতদিনকার সমস্ত খেই হারাইয়া যায়–তখন বাঁধা কাজের পক্ষে বড়োই মুশকিল ঘটে।

কিন্তু এই দিনই আমাদের বড়ো দিন–এই অনিয়মের দিন, এই কাজ নষ্ট করিবার দিন। যে দিনটা আসিয়া আমাদের প্রতিদিনকে বিপর্যস্ত করিয়া দেয় সেইদিন আমাদের আনন্দ। অন্যদিনগুলি বুদ্ধিমানের দিন, সাবধানের দিন, আর একটা দিন পুরা পাগলামির কাছে সম্পূর্ণভাবে উৎসর্গ-করা।

পাগল শব্দটা আমাদের কাছে ঘৃণার শব্দ নহে। খ্যাপা নিমাইকে আমরা খ্যাপা বলিয়া ভক্তি করি; আমাদের খ্যাপা দেবতা মহেশ্বর। প্রতিভা খ্যাপামির এক প্রকার বিকাশ কি না এ কথা লইয়া য়ুরোপে বাদানুবাদ চলিতেছে–কিন্তু আমরা এ কথা স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হইনা। প্রতিভা খ্যাপামি বৈকি, তাহা নিয়মের ব্যতিক্রম, তাহা উলট পালট করিতেই আসে–তাহা আজিকার এই খাপছাড়া সৃষ্টিছাড়া দিনের মতো হঠাৎ আসিয়া যত কাজের লোকের কাজ নষ্ট করিয়া দিয়া যায়–কেহ বা তাহাকে গালি পাড়িতে থাকে, কেহ বা তাহাকে লইয়া নাচিয়া-কুঁদিয়া অস্থির হইয়া উঠে।

ভোলানাথ, যিনি আমাদের শাস্ত্রে আনন্দময়, তিনি সকল দেবতার মধ্যে এমন খাপছাড়া। সেই পাগল দিগম্বরকে আমি আজিকার এই ধৌত নীলাকাশের রৌদ্র-প্লাবনের মধ্যে দেখিতেছি। এই নিবিড় মধ্যাহ্নের হৃৎপিন্ডের মধ্যে তাঁহার ডিমিডিমি ডমরু বাজিতেছে। আজ মৃত্যুর উলঙ্গ শুভমূর্তি এই কর্মনিরত সংসারের মাঝখানে কেমন নিস্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়াছে-সুন্দর শান্তচ্ছবি।

ভোলানাথ, আমি জানি, তুমি অদ্ভুত। জীবনে ক্ষণে ক্ষণে অদ্ভুত রূপেই তুমি তোমার ভিক্ষার ঝুলি লইয়া দাঁড়াইয়াছ। একেবারে হিসাব কিতাব নাস্তানাবুদ করিয়া দিয়াছ। তোমার নন্দীভৃঙ্গীর সঙ্গ আমার পরিচয় আছে। আজ তাহারা তোমার সিদ্ধির প্রসাদ যে এক ফোঁটা আমাকে দেয় নাই তাহা বলিতে পারি না; ইহাতে

আমার নেশা ধরিয়াছে, সমস্ত ভন্ডুল হইয়া গেছে-আজ আমার কিছুই গোছালো নাই।

আমি জানি, সুখ প্রতিদিনের সামগ্রী, আনন্দ প্রত্যহের অতীত। সুখ শরীরে কোথাও পাছে ধুলা লাগে বলিয়া সংকুচিত, আনন্দ ধুলায় গড়াগড়ি দিয়া নিখিলের সঙ্গ আপনার ব্যবধান ভাঙিয়া চুরমার করিয়া দেয়; এই জন্য সুখের পক্ষে ধুলা হেয়, আনন্দের পক্ষে ধুলা ভূষণ। সুখ, কিছু পাছে হারায় বলিয়া ভীত; আনন্দ, যথাসর্বস্ব বিতরণ করিয়া পরিতৃপ্ত; এইজন্য সুখের পক্ষে রিক্ততা দারিদ্র্য, আনন্দের পক্ষে দারিদ্র্যই ঐশ্বর্য। সুখ, ব্যবস্থার বন্ধনের মধ্যে আপনার শ্রীটুকুকে সতর্কভাবে রক্ষা করে; আনন্দ, সংহারের মুক্তির মধ্যে আপন সৌন্দর্যকে উদার ভাবে প্রকাশ করে; এইজন্য সুখ বাহিরের নিয়মে বদ্ধ, আনন্দ সে বন্ধন ছিন্ন করিয়া আপনার নিয়ম আপনিই সৃষ্টি করে। সুখ, সুধাটুকুর জন্য তাকাইয়া বসিয়া থাকে; আনন্দ, দুঃখের বিষকে অনায়াসে পরিপাক করিয়া ফেলে। এইজন্য কেবল ভালোটুকুর দিকেই সুখের পক্ষপাত, আর আনন্দের পক্ষে ভালো মন্দ দুই-ই সমান।

এই সৃষ্টির মধ্যে একটি পাগল আছেন, যাহা-কিছু অভাবনীয় তাহা খামখা তিনিই আনিয়া উপস্থিত করেন। তিনি কেন্দ্রাতিগ, “সেন্ট্রিফ্যুগল’–তিনি কেবলই নিখিলকে নিয়মের বাহিরের দিকে টানিতেছেন। নিয়মের দেবতা সংসারের সমস্ত পথকে পরিপূর্ণ চক্রপথ করিয়া তুলিবার চেষ্টা করিতেছেন, আর এই পাগল তাহাকে আক্ষিপ্ত করিয়া কুন্ডলী-আকার করিয়া তুলিতেছেন। এই পাগল আপনার খেয়ালে সরীসৃপের বংশে পাখি এবং বানরের বংশে মানুষ উদ্‌ভাবিত করিতেছেন। যাহা হইয়াছে, যাহা আছে, তাহাকেই চিরস্থায়ী রূপে রক্ষা করিবার জন্য সংসারে একটা বিষম চেষ্টা রহিয়াছে; ইনি সেটাকে ছারখার করিয়া দিয়া, যাহা নাই তাহারই জন্য পথ করিয়া দিতেছেন। ইহার হাতে বাঁশি নাই, সামঞ্জস্য সুর ইহার নহে; পিনাক বাজিয়া উঠে, বিধিবিহিত যজ্ঞ নষ্ট হইয়া যায়, এবং কোথা হইতে একটি অপূর্বতা উড়িয়া আসিয়া জুড়িয়া বসে। পাগলও ইঁহারই কীর্তি এবং প্রতিভাও ইঁহারই কীর্তি। ইঁহার টানে যাহার তার ছিঁড়িয়া যায় সে হয় উন্মাদ, আর যাহার তার অশ্রুতপূর্ব সুরে বাজিয়া উঠে সে হইল প্রতিভাবান! পাগলও দশের বাহিরে, প্রতিভাবানও

তাই; কিন্তু পাগল বাহিরেই থাকিয়া যায়, আর প্রতিভাবান দশকে একাদশের কোঠায় টানিয়া আনিয়া দশের অধিকার বাড়াইয়া দেন।

শুধু পাগল নয়, শুধু প্রতিভাবান নয়, আমাদের প্রতিদিনের একরঙা তুচ্ছতার মধ্যে হঠাৎ ভয়ংকর তাহার জ্বলজ্জটাকলাপ লইয়া দেখা দেয়। সেই ভয়ংকর, প্রকৃতির মধ্যে একটা অপ্রত্যাশিত উৎপাত, মানুষের মধ্যে একটা অসাধারণ পাপ আকারে জাগিয়া উঠে। তখন কত সুখমিলনের জাল লণ্ডভণ্ড, কত হৃদয়ের সম্বন্ধ ছারখার হইয়া যায়! হে রুদ্র, তোমার ললাটের যে ধ্বকধ্বক অগ্নিশিখার স্ফুলিঙ্গ মাত্রে অন্ধকারে গৃহের প্রদীপ জ্বলিয়া উঠে, সেই শিখাতেই লোকালয়ে সহস্রের হাহাধ্বনিতে নিশীথ রাত্রে গৃহদাহ উপস্থিত হয়। হায়, শম্ভু, তোমার নৃত্যে তোমার দক্ষিণ ও বাম পদক্ষেপে সংসারে মহাপূণ্য ও মহাপাপ উৎক্ষিপ্ত হইয়া উঠে। সংসারের উপরে প্রতিদিনের জড়হস্তক্ষেপে যে-একটা সামান্য তার এক টানা আবরণ পড়িয়া যায়, ভালোমন্দ দুয়েরই প্রবল আঘাতে তুমি তাহাকে ছিন্ন বিছিন্ন করিতে থাক ও প্রাণের প্রবাহকে অপ্রত্যাশিতের উত্তেজনায় ক্রমাগত তরঙ্গিত করিয়া শক্তির নব নব লীলা ও সৃষ্টির নব নব মূর্তি প্রকাশ করিয়া তোল। পাগল, তোমার এই রুদ্র আনন্দে যোগ দিতে আমার ভীত হৃদয় যেন পরাঙ্মুখ না হয়। সংহারের রক্ত-আকাশের মাঝখানে তোমার রবিকরোদ্দীপ্ত তৃতীয় নেত্র যেন ধ্রুবজ্যোতিতে আমার অন্তরের অন্তরকে উদ্ভাসিত করিয়া তোলে। নৃত্য করো, হে উন্মাদ, নৃত্য করো। সেই নৃত্যের ঘূর্ণ বেগে আকাশের লক্ষকোটিযোজনব্যাপী উজ্জ্বলিত নীহারিকা যখন ভ্রাম্যমান হইতে থাকিবে, তখন আমার বক্ষের মধ্যে ভয়ের আক্ষেপে যেন এই রুদ্র সংগীতের তাল কাটিয়া না যায়। হে মৃত্যুঞ্জয়, আমাদের সমস্ত ভালো এবং সমস্ত মন্দের মধ্যে তোমারই জয় হউক।

আমাদের এই খ্যাপা দেবতার আবির্ভাব যে ক্ষণে ক্ষণে তাহা নহে; সৃষ্টির মধ্যে ইহার পাগলামি অহরহ লাগিয়াই আছে, আমরা ক্ষণে ক্ষণে তাহার পরিচয় পাই মাত্র। অহরহই জীবনকে মৃত্যু নবীন করিতেছে, ভালোকে মন্দ উজ্জ্বল করিতেছে, তুচ্ছকে অভাবনীয় মূল্যবান করিতেছে। যখন পরিচয় পাই তখনি রূপের মধ্যে অপরূপ, বন্ধনের মধ্যে মুক্তির প্রকাশ, আমাদের কাছে জাগিয়া উঠে।

আজিকার এই মেঘোন্মুক্ত আলোকের মধ্যে আমার কাছে সেই অপরূপের মূর্তি জাগিয়াছে। সম্মুখের ঐ রাস্তা, ঐ খোড়ো-চাল-দেওয়া মুদির দোকান, ঐ ভাঙা ভিটা, ঐ সরু গলি, ঐ গাছপালাগুলিকে প্রতিদিনের পরিচয়ের মধ্যে অত্যন্ত তুচ্ছ করিয়া দেখিয়াছিলাম। এইজন্য উহারা আমাকে বদ্ধ করিয়া ফেলিয়াছিল-রোজ এই ক'টা জিনিসের মধ্যেই নজরবন্দী করিয়া রাখিয়াছিল। আজ হঠাৎ তুচ্ছতা একেবারে চলিয়া গেছে। আজ দেখিতেছি, চির-অপরিচিতকে এতদিন পরিচিত বলিয়া দেখিতেছিলাম, ভালো করিয়া দেখিতেছিলামই না। আজ এই যাহা-কিছু সমস্তকেই দেখিয়া শেষ করিতে পারিতেছি না। আজ সেই-সমস্তই আমার চারিদিকে আছে, অথচ তাহারা আমাকে আটক করিয়া রাখে নাই, তাহারা প্রত্যেকেই আমাকে পথ ছাড়িয়া দিয়াছে। আমার পাগল এইখানেই ছিলেন-সেই অপূর্ব, অপরিচিত অপরূপ, এই মুদির দোকানের খোড়ো চালের শ্রেণীকে অবজ্ঞা করেন নাই-কেবল, যে আলোকে তাহাকে দেখা যায় সে আলোক আমার চোখের উপরে ছিল না। আজ আশ্চর্য এই যে, ঐ সম্মুখের দৃশ্য, ঐ কাছের জিনিস আমার কাছে একটি বহু সুদূরের মহিমা লাভ করিয়াছে। উহার সঙ্গ গৌরীশংকরের তুষারবেষ্টিত দুর্গমতা, মহাসমুদ্রের তরঙ্গচঞ্চল দুস্তরতা আপনাদের সজাতিত্ব জ্ঞাপন করিতেছে।

এমনি করিয়া হঠাৎ এক দিন জানিতে পারা যায়, যাহার সঙ্গ অত্যন্ত ঘরকন্যা পাতাইয়া বসিয়াছিলাম সে আমার ঘরকন্যার বাহিরে। আমি যাহাকে প্রতি মুহূর্তে বাঁধা-বরাদ্দ বলিয়া নিতান্ত নিশ্চিন্ত হইয়াছিলাম তাহার মতো দুর্লভ দুরায়ত্ত জিনিস কিছুই নাই। আমি যাহাকে ভালো রূপ জানি মনে করিয়া তাহার চারিদিকে সীমানা আঁকিয়া দিয়া খাতির- জমা হইয়া বসিয়াছিলাম, সে দেখি কখনো এক মুহূর্তের মধ্যে সমস্ত সীমানা পার হইয়া অপূর্বরহস্যময় হইয়া উঠিয়াছে। যাহাকে নিয়মের দিক দিয়া, স্থিতির দিক দিয়া বেশ ছোটোখাটো, বেশ দস্তুর-সংগত, বেশ আপনার বলিয়াই বোধ হইয়াছিল, তাহাকে ভাঙনের দিক হইতে, ঐ শ্মশানচারী পাগলের তরফ হইতে হঠাৎ দেখিতে পাইলে মুখে আর বাক্য সরে না-আশ্চর্য! ও কে! যাহাকে চিরদিন জানিয়াছি সেই, এ কে! যে এক দিকে ঘরের সে আর-এক দিকে

অন্তরের, যে এক দিকে কাজের সে আর-এক দিকে সমস্ত আবশ্যকের বাহিরে যাহাকে এক দিকে স্পর্শ করিতেছি সে আর-এক দিকের সমস্ত আয়ত্তের অতীত- যে এক-দিকে সকলের সঙ্গ বেশ খাপ খাইয়া গিয়াছে সে আর-এক দিকে ভয়ংকর খাপছাড়া, আপনাতে আপনি।

প্রতিদিন যাঁহাকে দেখি নাই আজ তাঁহাকে দেখিলাম, প্রতিদিনের হাত হইতে মুক্তিলাভ করিয়া বাঁচিলাম। আমি ভাবিতেছিলাম চারিদিকের পরিচিতের বেড়ার মধ্যে প্রাত্যহিক নিয়মের দ্বারা আমি বাঁধা, আজ দেখিতেছি মহা-অপূর্বের কোলের মধ্যে চিরদিন আমি খেলা করিতেছি। আমি ভাবিতেছিলাম আপিসের বড়োসাহেবের মতো অত্যন্ত একজন সুগম্ভীর হিসাবি লোকের হাতে পড়িয়া সংসারের প্রত্যহ আঁক পাড়িয়া যাইতেছি, আজ সেই বড়ো-সাহেবের চেয়ে যিনি বড়ো সেই মস্ত বেহিসেবি পাগলের বিপুল উদার অট্টহাস্য জলে স্থলে আকাশে সপ্তলোক ভেদ করিয়া ধ্বনিত শুনিয়া হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলাম। আমার খাতাপত্র সমস্ত রহিল। আমার জরুরি কাজের বোঝা ঐ সৃষ্টি ছাড়ার পায়ের কাছে ফেলিয়া দিলাম-তাঁহার তান্ডব নৃত্যের আঘাতে তাহা চূর্ণ চূর্ণ হইয়া ধূলি হইয়া উড়িয়া যাক।

শ্রাবণ, ১৩১১

রঙ্গমঞ্চ

ভরতের নাট্যশাস্ত্রে নাট্যমঞ্চের বর্ণনা আছে। তাহাতে দৃশ্যপটের কোনো উল্লেখ দেখিতে পাই না। তাহাতে যে বিশেষ ক্ষতি হইয়াছিল, এরূপ আমি বোধ করি না।

কলাবিদ্যা যেখানে একেশ্বরী সেইখানেই তাহার পূর্ণ গৌরব। সতিনের সঙ্গ ঘর করিতে গেলে তাহকে খাটো হইতেই হইবে। বিশেষত সতিন যদি প্রবল হয়। রামায়ণকে যদি সুর করিয়া পড়িতে হয় তবে আদিকাণ্ড হইতে উত্তরকান্ড পর্যন্ত সে সুরকে চিরকাল সমান একঘেয়ে হইয়া থাকিতে হয়, রাগিণী-হিসাবে সে বেচারার কোনোকাল পদোন্নতি ঘটে না। যাহা উচ্চদরের কাব্য তাহা আপনার সংগীত আপনার নিয়মেই জোগাইয়া থাকে, বাহিরের সংগীতের সাহায্য অবজ্ঞার সঙ্গ উপেক্ষা করে। যাহা উচ্চ-অঙ্গের সংগীত তাহা আপনার কথা আপনার নিয়মেই বলে, তাহা কথার জন্য কালিদাস-মিলটনের মুখাপেক্ষা করে না–তাহা নিতান্ত তুচ্ছ তোম-তানা-নানা লইয়াই চমৎকার কাজ চালাইয়া দেয়। ছবিতে গানেতে কথায় মিশাইয়া ললিতকলার একটা বারোয়ারি ব্যাপার করা যাইতে পারে, কিন্তু সে কতকটা খেলা-হিসাবে; তাহা হাটের জিনিস, তাহাকে রাজকীয় উৎসবের উচ্চ আসন দেওয়া যাইতে পারে না।

কিন্তু শ্রাব্যকাব্যের চেয়ে দৃশ্যকাব্য স্বভাবতই কতকটা পরাধীন বটে। বাহিরের সাহায্যেই নিজেকে সার্থক করিবার জন্য সে বিশেষভাবে সৃষ্ট। সে যে অভিনয়ের জন্য অপেক্ষা করিয়া আছে, এ কথা তাহাকে স্বীকার করিতেই হয়।

আমরা এ কথা স্বীকার করি না। সাধ্বী স্ত্রী যমন স্বামীকে ছাড়া আর-কাহাকেও চায় না, ভালো কাব্য তেমনি ভাবুক ছাড়া আর-কাহারো অপেক্ষা করে না। সাহিত্য পাঠ করিবার সময় আমরা সকলেই মনে মনে অভিনয় করিয়া থাকি; সে অভিনয়ে যে কাব্যের সৌন্দর্য্য খোলে না সে কাব্য কোনো কবিকে যশস্বী করে নাই।

বরঞ্চ এ কথা বলিতে পারো যে, অভিনয়বিদ্যা নিতান্ত পরাশ্রিতা। সে অনাথা নাটকের জন্য পথ চাহিয়া বসিয়া থাকে। নাটকের গৌরব অবলম্বন করিয়াই সে আপনার গৌরব দেখাইতে পারে।

স্ত্রৈণ স্বামী যেমন লোকের কাছে উপহাস পায়, নাটক তেমনি যদি অভিনয়ের অপেক্ষা করিয়া আপনাকে নানা দিকে খর্ব করে তবে সে-ও সেইরূপ উপহাসের যোগ্য হইয়া উঠে। নাটকের ভাবখানা এইরূপ হওয়া উচিৎ যে, "আমার যদি অভিনয় হয় তো হউক, না হয় তো অভিনয়ের পোড়াকপাল–আমার কোনোই ক্ষতি নাই।'

যাহাই হউক, অভিনয়কে কাব্যের অধীনতা স্বীকার করিতেই হয়। কিন্তু তাই বলিয়া সকল কলাবিদ্যারই গোলামি তাহাকে করিতে হইবে এমন কী কথা আছে। যদি সে আপনার গৌরব রাখিতে চায় তবে যেটুকু অধীনতা তাহার আত্মপ্রকাশের জন্য নিতান্তই না হইলে নয় সেইটুকুই সে যেন গ্রহণ করে; তাহার বেশি সে যাহা-কিছু অবলম্বন করে তাহাতে তাহার নিজের অবমাননা হয়।

ইহা বলা বাহুল্য, নাট্যোক্ত কথাগুলি অভিনেতার পক্ষে নিতান্ত আবশ্যক। কবি তাহাকে য হাসির কথাটি জোগান তাহা লইয়াই তাহাকে হাসিতে হয়; কবি তাহাকে যে কান্নার অবসর দেন তাহা লইয়াই কাঁদিয়া সে দর্শকের চোখে জল টানিয়া আনে। কিন্তু ছবিটা কেন? তাহা অভিনেতার পশ্চাতে ঝুলিতে থাকে, অভিনেতা তাহাকে সৃষ্টি করিয়া তোলে না; তাহা আঁকামাত্র; আমার মতে তাহাতে অভিনেতার অক্ষমতা, কাপুরুষতা প্রকাশ পায়। এইরূপে যে উপায়ে দর্শকদের মনে বিভ্রম উৎপাদন করিয়া সে নিজের কাজকে সহজ করিয়া তোলে তাহা চিত্রকরের কাছ হইতে ভিক্ষা করিয়া আনা।

তা ছাড়া, যে দর্শক তোমার অভিনয় দেখিতে আসিয়াছে তাহার কি নিজের সম্বল কানা-কড়াও নাই? সে কি শিশু? বিশ্বাস করিয়া তাহার উপরে কি কোনো বিষয়েই

নির্ভর করিবার জো নাই? যদি তাহা সত্য হয়, তবে ডবল দাম দিলেও এমন-সকল লোককে টিকিট বেচিতে নাই।

এতো আদালতের কাছে সাক্ষ্য দেওয়া নয় যে, প্রত্যেক কথাটাকে হলফ করিয়া প্রমাণ করিতে হইবে। যাহারা বিশ্বাস করিবার জন্য, আনন্দ করিবার জন্য আসিয়াছে, তাহাদিগকে এত ঠকাইবার আয়োজন কেন? তাহারা নিজের কল্পনাশক্তি বাড়িতে চাবিবন্ধ করিয়া আসে নাই। কতক তুমি বোঝাইবে, কতক তাহারা বুঝিবে, তোমার সহিত তাহাদের এইরূপ আপসের সম্বন্ধ।

দুষ্যন্ত গাছের গুঁড়ির আড়ালে দাঁড়াইয়া সখীদের সহিত শকুন্তলার কথাবার্তা শুনিতেছেন। অতি উত্তম। কথাবার্তা বেশ রসে জমাইয়া বলিয়া যাও। আস্ত গাছের গুঁড়িটা আমার সম্মুখে উপস্থিত না থাকিলেও সেটা আমি ধরিয়া লইতে পারি– এতটুকু সৃজনশক্তি আমার আছে। দুষ্যন্ত-শকুন্তলা অনুসূয়া-প্রিয়ংবদার চরিত্রানুরূপ প্রত্যেক হাবভাব এবং কণ্ঠস্বরর প্রত্যেক ভঙ্গি একেবারে প্রত্যক্ষবৎ অনুমান করিয়া লওয়া শক্ত, সুতরাং সেগুলি যখন প্রত্যক্ষ বর্তমান দেখিতে পাই তখন হৃদয় রসে অভিষিক্ত হয়; কিন্তু দুটো গাছ বা একটা ঘর বা একটা নদী কল্পনা করিয়া লওয়া কিছুই শক্ত নয়–সেটাও আমাদের হাতে না রাখিয়া চিত্রের দ্বারা উপস্থিত করিলে আমাদের প্রতি ঘোরতর অবিশ্বাস প্রকাশ করা হয়।

আমাদের দেশের যাত্রা আমার ঐজন্য ভালো লাগে। যাত্রার অভিনয়ে দর্শক ও অভিনেতার মধ্যে একটা গুরুতর ব্যবধান নাই। পরস্পরের বিশ্বাস ও আনুকূল্যের প্রতি নির্ভর করিয়া কাজটা বেশ সহৃদয়তার সহিত সুসম্পন্ন হইয়া ওঠে। কাব্যরস, যেটা আসল জিনিস, সেইটেই অভিনয়ের সাহায্যে ফোয়ারার মতো চারি দিকে দর্শকদের পুলকিত চিত্তের উপর ছড়াইয়া পড়ে। মালিনী যখন তাহার পুষ্পবিরল বাগানে ফুল খুঁজিয়া বেলা করিয়া দিতেছে তখন সেটাকে সপ্রমাণ করিবার জন্য আসরের মধ্যে আস্ত আস্ত গাছ আনিয়া ফেলিবার কী দরকার আছে–একা মালিনীর মধ্যে সমস্ত বাগান আপনি জাগিয়া উঠে। তাই যদি না হইবে তবে মালিনীরই বা কী গুণ, আর দর্শকগুলোই বা কাঠের মূর্তির মতো কী করিতে বসিয়া আছে?

শকুন্তলার কবিকে যদি রঙ্গমঞ্চ দৃশ্যপটের কথা ভাবিতে হইত, তবে তিনি গোড়াতেই মৃগের পশ্চাতে রথ ছোটানো বন্ধ করিতেন। অবশ্য, তিনি বড়ো কবি-রথ বন্ধ হইলেও যে তাঁহার কলম বন্ধ হইত তাহা নহে; কিন্তু আমি বলিতেছি, যটা তুচ্ছ তাহার জন্য যাহা বড়ো তাহা কেন নিজেকে কোনো অংশে খর্ব করিতে যাইবে? ভাবুকের চিত্তের মধ্যে রঙ্গমঞ্চ আছে, সে রঙ্গমঞ্চ স্থানাভাব নাই। সেখানে জাদুকরের হাতে দৃশ্যপট আপনি রচিত হইতে থাকে। সেই মঞ্চ, সেই পটই নাট্যকারের লক্ষ্যস্থল, কোনো কৃত্রিম মঞ্চ ও কৃত্রিম পট কবিকল্পনার উপযুক্ত হইতে পারে না।

অতএব, যখন দুষ্যন্ত ও সারথি একই স্থানে স্থির দাঁড়াইয়া বর্ণনা ও অভিনয়ের দ্বারা রথবেগের আলোচনা করেন, সেখানে দর্শক এই অতি সামান্য কথাটুকু অনায়াসেই ধরিয়া লন যে, মঞ্চ ছোটো, কিন্তু কাব্য ছোটো নয়; অতএব কাব্যের খাতিরে মঞ্চর এই অনিবার্য ত্রুটিকে প্রসন্নচিত্তে তাঁহারা মার্জনা করেন এবং নিজের চিত্তক্ষত্রকে সেই ক্ষুদ্রায়তনের মধ্যে প্রসারিত করিয়া দিয়া মঞ্চকেই মহীয়ান করিয়া তোলেন। কিন্তু মঞ্চর খাতিরে কাব্যকে যদি খাটো-হইতে হইত, তবে ঐ কয়েকটা হতভাগ্য কাষ্ঠখণ্ডকে কে মাপ করিতে পারিত?

শকুন্তলা-নাটক বাহিরের চিত্রপটের কোনো অপেক্ষা রাখে নাই বলিয়া আপনার চিত্রপটগুলিকে আপনি সৃষ্টি করিয়া লহিয়াছে। তাহার কর্ন্বাশ্রম, তাহার স্বর্গপথের মেঘলোক, তাহার মারীচের তপোবনের জন্য সে আর-কাহারো উপর কোনো বরাত দেয় নাই। সে নিজেকে নিজে সম্পূর্ণ করিয়া তুলিয়াছে। কি চরিত্রসৃজনে কি স্বভাবচিত্রে, নিজের কাব্যসম্পদের উপরেই তাহার একমাত্র নির্ভর।

আমরা অন্য প্রবন্ধে বলিয়াছি, য়ুরোপীয়ের বাস্তব সত্য নহিলে নয়। কল্পনা যে কেবল তাহাদের চিত্তরঞ্জন করিবে তাহা নয়, কাল্পনিককে অবিকল বাস্তবিকের মতো করিয়া বালকের মতো তাহাদিগকে ভুলাইবে। কেবল কাব্যরসের প্রাণদায়িনী বিশল্যকরণীটুকু হইলে চলিবে না, তাহার সঙ্গ বাস্তবিকতার আস্ত গন্ধমাদনটা

পর্যন্ত চাই। এখন কলিযুগ, সুতরাং গন্ধমাদন টানিয়া আনিতে এঞ্জিনিয়ারিং চাই–তাহার ব্যয়ও সামান্য নহে। বিলাতের স্টেজে শুদ্ধমাত্র এই খেলার জন্য যে বাজে খরচ হয়, ভারতবর্ষের কত অভ্রভেদী দুর্ভিক্ষ তাহার মধ্যে তলাইয়া যাইতে পারে।

প্রাচ্যদেশের ক্রিয়াকর্ম খেলা-আনন্দ সমস্ত সরল-সহজ। কলাপাতায় আমাদের ভোজ সম্পন্ন হয় বলিয়া ভোজের যাহা প্রকৃততম আনন্দ, অর্থাৎ বিশ্বকে অবারিতভাবে নিজের ঘরটুকুর মধ্যে আমন্ত্রণ করিয়া আনা, সম্ভবপর হয়। আয়োজনের ভার যদি জটিল ও অতিরিক্ত হইত তবে আসল জিনিসটাই মারা যাইত।

বিলাতের নকলে আমরা যে থিয়েটার করিয়াছি তাহা ভারাক্রান্ত একটা স্ফীত পদার্থ। তাহাকে নড়ানো শক্ত, তাহাকে আপামর সকলের দ্বারের কাছে আনিয়া দেওয়া দুঃসাধ্য; তাহাতে লক্ষ্মীর পেঁচাই সরস্বতী পদ্মকে প্রায় আচ্ছন্ন করিয়া আছে। তাহাতে কবি ও গুণীর প্রতিভার চেয়ে ধনীর মূলধন ঢের বেশি থাকা চাই। দর্শক যদি বিলাতি ছেলেমানুষিতে দীক্ষিত না হইয়া থাকে এবং অভিনেতার যদি নিজের প্রতি ও কাব্যের প্রতি যথার্থ বিশ্বাস থাকে, তবে অভিনয়ের চারি দিক হইতে তাহার বহুমূল্য বাজে জঞ্জালগুলো ঝাঁট দিয়া ফেলিয়া তাহাকে মুক্তিদান ও গৌরবদান করিলেই সহৃদয় হিন্দুসন্তানের মতো কাজ হয়। বাগানকে যে অবিকল বাগান আঁকিয়াই খাঁড়া করিতে হইবে এবং স্ত্রীচরিত্র অকৃত্রিম স্ত্রীলোককে দিয়াই অভিনয় করাইতে হইবে, এইরূপ অত্যন্ত স্থূল বিলাতি বর্বরতা পরিহার করিবার সময় আসিয়াছে।

মোটের উপরে বলা যাইতে পারে যে, জটিলতা অক্ষমতারই পরিচয়; বাস্তবিকতা কাঁচপোকার মতো আর্টের মধ্যে প্রবেশ করিলে তেলাপোকার মতো তাহার অন্তরের সমস্ত রস নিঃশেষ করিয়া ফেলে, এবং যেখানে অজীর্ণবশত যথার্থ রসের ক্ষুধার অভাব সেখানে বহুমূল্য বাহ্য প্রাচুর্য ক্রমশই ভীষণরূপে বাড়িয়া চলে–অবশেষে অন্নকে সম্পূর্ণ আচ্ছন্ন করিয়া চাটনিই স্তূপাকার হইয়া উঠে।

পৌষ, ১৩০৯

সূচিপত্র

কেকাধ্বনি

হঠাৎ গৃহপালিত ময়ূরের ডাক শুনিয়া আমার বন্ধু বলিয়া উঠিলেন-আমি ঐ ময়ূরের ডাক সহ্য করিতে পারি না; কবিরা কেকারবকে কেন যে তাঁহাদের কাব্যে স্থান দিয়াছেন বুঝিবার জো নাই।

কবি যখন বসন্তের কুহুস্বর এবং বর্ষার কেকা, দুটাকেই সমান আদর দিয়াছেন তখন হঠাৎ মনে হইতে পারে কবির বুঝি বা কৈবল্যদশাপ্রাপ্তি হইয়াছে-তাঁহার কাছ ভালো ও মন্দ, ললিত ও কর্কশের ভেদ লুপ্ত।

কেবল কেকা কেন, ব্যাঙের ডাক ও ঝিল্লীর ঝংকারকে কেহ মধুর বলিতে পারে না। অথচ কবিরা এ শব্দগুলিকে উপেক্ষা করেন নাই। প্রেয়সীর কণ্ঠস্বরের সহিত ইহাদের তুলনা করিতে সাহস পান নাই, কিন্তু ষড়্ঋতুর মহাসংগীতের প্রধান অঙ্গ বলিয়া তাঁহারা ইহাদিগকে সম্মান দিয়াছেন।

এক প্রকারের মিষ্টতা আছে তাহা নিঃসংশয় মিষ্ট, নিতান্তই মিষ্ট। তাহা নিজের লালিত্য সপ্রমাণ করিতে মুহূর্তমাত্র সময় লয় না। ইন্দ্রিয়ের অসন্দিগ্ধ সাক্ষ্য লইয়া মন তাহার সৌন্দর্য স্বীকার করিতে কিছুমাত্র তর্ক করে না। তাহা আমাদের মনের নিজের আবিষ্কার নহে, ইন্দ্রিয়ের নিকট হইতে পাওয়া। এইজন্য মন তাহাকে অবজ্ঞা করে; বলে, ও নিতান্তই মিষ্ট, কেবলই মিষ্ট। অর্থাৎ উহার মিষ্টতা বুঝিতে অন্তঃকরণের কোনো প্রয়োজন হয় না, কেবলমাত্র ইন্দ্রিয়ের দ্বারাই বোঝা যায়। যাহারা গানের সমজদার এই জন্যই তাহারা অত্যন্ত উপেক্ষা প্রকাশ করিয়া বলে, অমূক লোক মিষ্ট গান করে। ভাবটা এই যে, মিষ্ট গায়ক গানকে আমাদের ইন্দ্রিয়সভায় আনিয়া নিতান্ত সুলভ প্রশংসা দ্বারা অপমানিত করে; মার্জিত রুচি ও শিক্ষিত মনের দরবারে সে প্রবেশ করে না। যে লোক পাটের অভিজ্ঞ যাচনদার সে রসসিক্ত পাট চায় না; সে বলে, আমাকে শুকনো পাট দাও, তবেই আমি ঠিক ওজনটা বুঝিব। গানের উপযুক্ত সমঝদার বলে, বাজে রস দিয়া গানের বাজে গৌরব বাড়াইয়ো না, আমাকে শুকনো মাল দাও, তবেই আমি ঠিক ওজনটি পাইব,

আমি খুশি হইয়া ঠিক দামটি চুকাইয়া দিব। বাহিরের বাজে মিষ্টতায় আসল জিনিসের মূল্য নামাইয়া দেয়।

যাহা সহজেই মিষ্ট তাহাতে অতি শীঘ্র মনের আলস্য আনে, বেশিক্ষণ মনোযোগ থাকে না। অবিলম্বেই তাহার সীমায় উত্তীর্ণ হইয়া মন বলে, আর কেন, ঢের হইয়াছে।

এইজন্য যে লোক যে বিষয়ে বিশেষ শিক্ষা লাভ করিয়াছে সে তাহার গোড়ার দিককার নিতান্ত সহজ ও ললিত অংশকে আর খাতির করে না। কারণ, সেটুকুর সীমা সে জানিয়া লইয়াছে; সেটুকুর দৌড় যে বেশিদূর নহে তাহা সে বোঝে; এইজন্য তাহার অন্তঃকরণ তাহাতে জাগে না। অশিক্ষিত সেই সহজ অংশটুকুই বুঝিতে পারে, অথচ তখনো সে তাহার সীমা পায় না-এইজন্যই সেই অগভীর অংশেই তাহার একমাত্র আনন্দ। সমঝদারের আনন্দকে সে একটা কিম্ভূত ব্যাপার বলিয়া মনে করে, অনেক সময় তাহাকে কপটতার আড়ম্বর বলিয়াও গণ্য করিয়া থাকে।

এইজন্যই সর্বপ্রকার কলাবিদ্যাসম্বন্ধে শিক্ষিত ও অশিক্ষিতের আনন্দ ভিন্ন ভিন্ন পথে যায়। তখন এক পক্ষ বলে, তুমি কী বুঝিবে! আর-এক পক্ষ রাগ করিয়া বলে, যাহা বুঝিবার তাহা কেবল তুমিই বোঝ, জগতে আর-কেহ বোঝে না।

একটি সুগভীর সামঞ্জস্যের আনন্দ, সংস্থান-সমাবেশের আনন্দ, দূরবর্তীর সহিত যোগ-সংযোগের আনন্দ, পার্শ্ববর্তীর সহিত বৈচিত্র্য-সাধনের আনন্দ-এইগুলি মানসিক আনন্দ। ভিতরে প্রবেশ না করিলে, না বুঝিলে, এ আনন্দ ভোগ করিবার উপায় নাই। উপর হইতেই চট্ করিয়া যে সুখ পাওয়া যায়, ইহা তাহা অপেক্ষা স্থায়ী ও গভীর।

এবং এক হিসাবে তাহা অপেক্ষা ব্যাপক। যাহা অগভীর, লোকের শিক্ষা বিস্তারের সঙ্গ, অভ্যাসের সঙ্গ ক্রমেই তাহা ক্ষয় হইয়া তাহার রিক্ততা বাহির হইয়া পড়ে।

যাহা গভীর তাহা আপাতত বহুলোকের গম্য না হইলেও বহুকাল তাহার পরমায়ু থাকে, তাহার মধ্যে যে-একটি শ্রেষ্টতার আদর্শ আছে তাহা সহজে জীর্ণ হয় না।

জয়দেবের “ললিতলবঙ্গলতা’ ভালো বটে, কিন্তু বেশিক্ষণ নহে। ইন্দ্রিয় তাহাকে মন-মহারাজের কাছে নিবেদন করে, মন তাহাকে একবার স্পর্শ করিয়াই রাখিয়া দেয়–তখন তাহা ইন্দ্রিয়ের ভোগেই শেষ হইয়া যায়। “ললিতলবঙ্গলতা’র পার্শ্বে কুমারসম্ভবের একটা শ্লোক ধরিয়া দেখা যাক–

আবর্জিতা কিঞ্চিদিব স্তনাভ্যাং
বাসো বসানা তরুণার্করাগম্ ।
পর্যাপ্তপুষ্পস্তবকাবনম্রা
সঞ্চারিণী পল্লবিনী লতেব ।

ছন্দ আলুলায়িত নহে, কথাগুলি যুক্তাক্ষরবহুল; তবু ভ্রম হয়, এই শ্লোক “ললিতলবঙ্গলতা’র অপেক্ষা কানেও মিষ্ট শুনাইতেছে। কিন্তু তাহা ভ্রম। মন নিজের সৃজনশক্তির দ্বারা ইন্দ্রিয়সুখ পূরণ করিয়া দিতেছে। যেখানে লোলুপ ইন্দ্রিয়গণ ভিড় করিয়া না দাঁড়ায় সেইখানেই মন এইরূপ সৃজনের অবসর পায়। “পর্যাপ্তপুষ্পস্তবকাবনম্রা’–ইহার মধ্যে লয়ের যে উত্থান আছে, কঠোরে কোমলে যথাযথরূপে মিশ্রিত হইয়া ছন্দকে যে দোলা দিয়াছে, তাহা জয়দেবী লয়ের মতো অতিপ্রত্যক্ষ নহে; তাহা নিগূঢ়; মন তাহা আলস্যভরে পড়িয়া পায় না, নিজে আবিষ্কার করিয়া লইয়া খুশি হয়। এই শ্লোকের মধ্যে যে-একটি ভাবের সৌন্দর্য তাহাও আমাদের মনের সহিত চক্রান্ত করিয়া অশ্রুতিগম্য একটি সংগীত রচনা করে, সে সংগীত সমস্ত শব্দসংগীতকে ছাড়াইয়া চলিয়া যায়; মনে হয়, যেন কান জুড়াইয়া গেল–কিন্তু কান জুড়াইবার কথা নহে, মানসী মায়ায় কানকে প্রতারিত করে।

আমাদের এই মায়াবী মনটিকে সৃজনের অবকাশ না দিলে, সে কোনো মিষ্টতাকেই বেশিক্ষণ মিষ্ট বলিয়া গণ্য করেনা। সে উপযুক্ত উপকরণ পাইলে কঠোর ছন্দকে

ললিত, কঠিন শব্দকে কোমল করিয়া তুলিতে পারে। সেই শক্তি খাটাইবার জন্য সে কবিদের কাছে অনুরোধ প্রেরণ করিতেছে।

কেকারব কানে শুনিতে মিষ্ট নহে, কিন্তু অবস্থাবিশেষে সময়বিশেষে মন তাহাকে মিষ্ট করিয়া শুনিতে পারে, মনের সেই ক্ষমতা আছে। সেই মিষ্টতার স্বরূপ, কুহুতানের মিষ্টতা হইতে স্বতন্ত্র। নববর্ষাগমে গিরিপাদমূলে লতাজটিল প্রাচীন মহারণ্যের মধ্য যে মত্ততা উপস্থিত হয় কেকারব তাহারই গান। আষাঢ় শ্যামায়মান তমালতালীবনের দ্বিগুণতর ঘনায়িত অন্ধকারে, মাতৃস্তন্যপিপাসু ঊর্ধ্ববাহু শতসহস্র শিশুর মতো অগণ্য শাখাপ্রশাখার আন্দোলিত মর্মরমুখর মহোল্লাসের মধ্য, রহিয়া-রহিয়া কেকা তারস্বরে যে একটি কাংসক্রেংকারধ্বনি উত্থিত করে তাহাতে প্রবীণ বনস্পতিমন্ডলীর মধ্যে আরণ্যমহোৎসবের প্রাণ জাগিয়া উঠে। কবির কেকারব সেই বর্ষার গান; কান তাহার মাধুর্য জানে না, মনই জানে। সেইজন্য মন তাহাতে অধিক মুগ্ধ হয়। মন তাহার সঙ্গ সঙ্গ আরো অনেকখানি পায়-সমস্ত মেঘাবৃত আকাশ, ছায়াবৃত অরণ্য,নীলিমাচ্ছন্ন গিরি শিখর, বিপুল মূঢ় প্রকৃতির অব্যক্ত অন্ধ আনন্দরাশি।

বিরহিণীর বিরহবেদনার সঙ্গ কবির কেকারব এইজন্যই জড়িত। তাহা শ্রুতিমধুর বলিয়া পথিকবধূকে ব্যাকুল করে না, তাহা সমস্ত বর্ষার মর্মোদ্‌ঘাটন করিয়া দেয়। নরনারীর প্রেমের মধ্যে একটি অত্যন্ত আদিম প্রাথমিক ভাব আছে; তাহা বহিঃপ্রকৃতির অত্যন্ত নিকটবর্তী, তাহা জলস্থল-আকাশের গায়ে গায়ে সংলগ্ন। ষড়্‌ঋতু আপন পুষ্পপর্যায়ের সঙ্গ সঙ্গ এই প্রেমকে নানা রঙ রাঙাইয়া দিয়া যায়। যাহাতে পল্লবকে স্পন্দিত, নদীকে তরঙ্গিত, শষ্যশীর্ষকে হিল্লোলিত করে, তাহা ইহাকেও অপূর্ব চাঞ্চল্যে আন্দোলিত করিতে থাকে। পূর্ণিমার কোটাল ইহাকে স্ফীত করে এবং সন্ধ্যাভ্রের রক্তিমায় ইহাকে লজ্জামণ্ডিত বধূবেশ পরাইয়া দেয়। এক-একটি ঋতু যখন আপন সোনার কাঠি লইয়া প্রেমকে স্পর্শ করে, তখন সে রোমাঞ্চকলেবরে না জাগিয়া থাকিতে পারে না। সে অরণ্যের পুষ্পপল্লবেরই মতো প্রকৃতির নিগূঢ়স্পর্শাধীন। সেইজন্য যৌবনাবেশবিধুর কালিদাস ছয় ঋতুর ছয় তারে নরনারীর প্রেম কী কী সুরে বাজিতে থাকে তাহাই বর্ণনা করিয়াছেন; তিনি

বুঝিয়াছেন জগতে ঋতু-আবর্তনের সর্বপ্রধান কাজ প্রেম-জাগানো, ফুল ফোটানো প্রভৃতি অন্য সমস্তই তাহার আনুষঙ্গিক। তাই যে কেকারব বর্ষাঋতুর নিখাদ সুর তাহার আঘাত বিরহবেদনার ঠিক উপরে গিয়াই পড়ে।

বিদ্যাপতি লিখিয়াছেন –

মত্ত দাদুরী ডাকে ডাহুকী
ফাটি যাওত ছাতিয়া ।

এই ব্যাঙের ডাক নববর্ষার মত্তভাবের সঙ্গ নহে, ঘন বর্ষার নিবিড় ভাবের সঙ্গ বড়ো চমৎকার খাপ খায়। মেঘের মধ্যে আজ কোনো বর্ণবৈচিত্র্য নাই, স্তরবিন্যাস নাই; শচীর কোনো প্রাচীন কিংকরী আকাশের প্রাঙ্গণ মেঘ দিয়া সমান করিয়া লেপিয়া দিয়াছে, সমস্তই কৃষ্ণধূসরবর্ণ। নানাশস্যবিচিত্রা পৃথিবীর উপরে উজ্জ্বল আলোকের তুলিকা পড়ে নাই বলিয়া বৈচিত্র্য ফুটিয়া ওঠে নাই। ধানের কোমল মসৃণ সবুজ, পাটের গাঢ় বর্ণ এবং ইক্ষুর হরিদ্রাভা একটি বিশ্বব্যাপী-কালিমায় মিশিয়া আছে। বাতাস নাই। আসন্ন বৃষ্টির আশঙ্কায় পঙ্কিল পথে লোক বাহির হয় নাই। মাঠে বহুদিন পূর্বে খেতের কাজ সমস্ত শেষ হইয়া গেছে। পুকুরে পাড়ির সমান জল। এইরূপ জ্যোতির্হীন, গতিহীন, কর্মহীন, বৈচিত্র্যহীন, কালিমালিপ্ত একাকারের দিনে ব্যাঙর ডাক ঠিক সুরটি লাগাইয়া থাকে। তাহার সুর ঐ বর্ণহীন মেঘের মতো, এই দীপ্তিশূন্য আলোকের মতো, নিস্তব্ধ নিবিড় বর্ষাকে ব্যাপ্ত করিয়া দিতেছে; বর্ষার গন্ডিকে আরো ঘন করিয়া চারিদিকে টানিয়া দিতেছে। তাহা নীরবতার অপেক্ষাও একঘেয়ে। তাহা নিভৃত কোলাহল। ইহার সঙ্গ ঝিল্লীরব ভালোরূপ মেশে। কারণ, যেমন মেঘ, যমন ছায়া, তেমনি ঝিল্লীরবও আর-একটা আচ্ছাদনবিশেষ; তাহা স্বরমণ্ডলে অন্ধকারের প্রতিরূপ; তাহা বর্ষানিশীথিনীকে সম্পূর্ণতা দান করে।

ভাদ্র, ১৩০৮

বাজে কথা

অন্য খরচের চেয়ে বাজে খরচেই মানুষকে যথার্থ চেনা যায়। কারণ, মানুষ ব্যয় করে বাঁধা নিয়ম অনুসারে, অপব্যয় করে নিজের খেয়ালে।

যেমন বাজে খরচ, তেমনি বাজে কথা। বাজে কথাতেই মানুষ আপনাকে ধরা দেয়। উপদেশের কথা যে রাস্তা দিয়া চলে, মনুর আমল হইতে তাহা বাঁধা; কাজের কথা যে পথে আপনার গোযান টানিয়া আনে সে পথ কেজো সম্প্রদায়ের পায়ে পায়ে তৃণপুষ্পশূন্য চিহ্নিত হইয়া গেছে। বাজে কথা নিজের মতো করিয়াই বলিতে হয়।

এইজন্য চাণক্য ব্যক্তিবিশেষকে যে একেবারে চুপ করিয়া যাইতে বলিয়াছেন, সেই কঠোর বিধানের কিছু পরিবর্তন করা যাইতে পারে। আমাদের বিবেচনায় চাণক্যকথিত উক্ত ভদ্রলোক তাবচ্চ শোভতে যাবৎ তিনি উচ্চঅঙ্গর কথা বলেন, যাবৎ তিনি আবহমান কালের পরীক্ষিত সর্বজনবিদিত সত্য-ঘোষনায় প্রবৃত্ত থাকেন–কিন্তু তখনি তাঁহার বিপদ যখনি তিনি সহজ কথা নিজের ভাষায় বলিবার চেষ্টা করেন।

যে লোক একটা বলিবার বিশেষ কথা না থাকিলে কোনো কথাই বলিতে পারে না, হয় বেদবাক্য বলে নয় চুপ করিয়া থাকে, হে চতুরানন, তাহার কুটুম্বিতা, তাহার সাহচর্য, তাহার প্রতিবেশ–

শিরসি মা লিখ, মা লিখ, মা লিখ।

পৃথিবীতে জিনিসমাত্রই প্রকাশধর্মী নয়। কয়লা আগুন না পাইলে জ্বলে না,স্ফটিক অকারণে ঝক্‌ঝক্ করে। কয়লায় বিস্তর কল চলে, স্ফটিক হার গাঁথিয়া প্রিয়জনের গলায় পরাইবার জন্য। কয়লা আবশ্যক, স্ফটিক মূল্যবান।

এক-একটি দুর্লভ মানুষ এইরূপ স্ফটিকের মতো অকারণ ঝল্‌মল্‌ করিতে পারে। সে সহজেই আপনাকে প্রকাশ করিয়া থাকে, তাহার কোনো বিশেষ উপলক্ষের আবশ্যক হয় না। তাহার নিকট হইতে কোনো বিশেষ প্রয়োজন সিদ্ধ করিয়া লইবার গরজ কাহারো থাকে না; সে অনায়াসে আপনাকে আপনি দেদীপ্যমান করে, ইহা দেখিয়াই আনন্দ। মানুষ প্রকাশ এত ভালোবাসে, আলোক তাহার এত প্রিয় যে, আবশ্যককে বিসর্জন দিয়া, পেটের অন্ন ফেলিয়াও, উজ্জ্বলতার জন্য লালায়িত হইয়া উঠে। এই গুণটি দেখিলে, মানুষ যে পতঙ্গশ্রেষ্ঠ সে সম্বন্ধে সন্দেহ থাকে না। উজ্জ্বল চক্ষু দেখিয়া যে জাতি অকারণে প্রাণ দিতে পারে তাহার পরিচয় বিস্তারিত করিয়া দেওয়া বাহুল্য।

কিন্তু সকলেই পতঙ্গর ডানা লইয়া জন্মায় নাই। জ্যোতির মোহ সকলের নাই। অনেকেই বুদ্ধিমান, বিবেচক। গুহা দেখিলে তাঁহারা গভীরতার মধ্যে তলাইতে চেষ্টা করেন, কিন্তু আলো দেখিলে উপরে উড়িবার ব্যর্থ উদ্যমমাত্রও করেন না। কাব্য দেখিলে ইঁহারা প্রশ্ন করেন ইহার মধ্যে লাভ করিবার বিষয় কী আছে, গল্প শুনিলে অষ্টাদশ সংহিতার সহিত মিলাইয়া ইঁহারা ভূয়সী গবেষণার সহিত বিশুদ্ধ ধর্ম্মমতে দুয়ো বা বাহবা দিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া বসেন । যাহা অকারণ, যাহা অনাবশ্যক, তাহার প্রতি ইঁহাদের কোনো লোভ নাই।

যাহারা আলোক-উপাসক তাহারা এই সম্প্রদায়ের প্রতি অনুরাগ প্রকাশ করে নাই। তাহারা ইহাদিগকে যে-সকল নামে অভিহিত করিয়াছে আমরা তাহার অনুমোদন করি না। বররুচি ইঁহাদিগকে অরসিক বলিয়াছেন, আমাদের মতে ইহা রুচিগর্হিত । আমরা ইঁহাদিগকে যাহা মনে করি তাহা মনেই রাখিয়া দিই। কিন্তু প্রাচীনেরা মুখ সামলাইয়া কথা কহিতেন না তাহার পরিচয় একটি সংস্কৃত শ্লোকে পাই। ইহাতে বলা হইতেছে- সিংহনখরের দ্বারা উৎপাটিত একটি গজমুক্তা বনের মধ্যে পড়িয়াছিল, কোনো ভীলরমণী দূর হইতে দেখিয়া ছুটিয়া গিয়া তাহা তুলিয়া লইল, যখন টিপিয়া দেখিল তাহা পাকা কুল নহে, তাহা মুক্তামাত্র, তখন দূরে ছুঁড়িয়া ফেলিল। স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে, প্রয়োজনীয়তা-বিবেচনায় যাঁহারা সকল জিনিসের মূল্যনির্ধারণ করেন, শুদ্ধমাত্র সৌন্দর্য ও উজ্জ্বলতার বিকাশ যাঁহাদিগকে লেশমাত্র

বিচলিত করিতে পারে না, কবি বর্বরনারীর সহিত তাঁহাদের তুলনা দিতেছেন। আমাদের বিবেচনায় কবি ইঁহাদের সম্বন্ধে নীরব থাকিলই ভালো করিতেন-কারণ, ইঁহারা ক্ষমতাশালী লোক, বিশেষত, বিচারের ভার প্রায় ইঁহাদেরই হাতে। ইঁহারা গুরুমহাশয়ের কাজ করেন। যাঁহারা সরস্বতীর কাব্যকমলবনে বাস করেন তাঁহারা তটবর্তী বেত্রবনবাসীদিগকে উদ্‌বেজিত না করুন, এই আমার প্রার্থনা।

সাহিত্যের যথার্থ বাজে রচনাগুলি কোনো বিশেষ কথা বলিবার স্পর্ধা রাখে না। সংস্কৃত সাহিত্যে মেঘদূত তাহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। তাহা ধর্মের কথা নহে, কর্মের কথা নহে, পুরাণ নহে, ইতিহাস নহে। যে অবস্থায় মানুষের চেতন-অবচেতনের বিচার লোপ পাইয়া যায় ইহা সেই অবস্থার প্রলাপ। ইহাকে যদি কেহ বদরীফল মনে করিয়া পেট ভরাইবার আশ্বাসে তুলিয়া মন তবে তখনি ফেলিয়া দিবেন। ইহাতে প্রয়োজনের কথা কিছুই নাই। ইহা নিটোল মুক্তা, এবং ইহাতে বিরহীর বিদীর্ণ হৃদয়ের রক্তচিহ্ন কিছু লাগিয়াছে, কিন্তু সেটুকু মুছিয়া ফেলিলেও ইহার মূল্য কমিবে না।

ইহার কোনো উদ্দেশ্য নাই বলিয়াই এই কাব্যখানি এমন স্বচ্ছ, এমন উজ্জ্বল। ইহা একটি মায়াবতী; কল্পনার হাওয়ায় ইহার সজল-মেঘ-নির্মিত পাল ফুলিয়া উঠিয়াছে এবং একটি বিরহীর হৃদয়ের কামনা বহন করিয়া ইহা অবারিতবেগে একটি অপরূপ নিরুদ্দেশের অভিমুখে ছুটিয়া চলিয়াছে-আর-কোনো বোঝা ইহাতে নাই।

টেনিসন যে □□□□ □□□□□□, যে অকারণ অশ্রুবিন্দুর কথা বলিয়াছেন, মেঘদূত সেই বাজে চোখের জলের কাব্য। এই কথা শুনিয়া অনেকে আমার সঙ্গ তর্ক করিতে উদ্যত হইবেন। অনেকে বলিবেন, যক্ষ যখন প্রভুশাপে তাহার প্রেয়সীর নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াছে তখন মেঘদূতের অশ্রুধারাকে অকারণ বলিতেছেন কেন? আমি তর্ক করিতে চাই না, এ-সকল কথার আমি কোনো উত্তর দিব না। আমি জোর করিয়া বলিতে পারি, ঐ-যে যক্ষের নির্বাসন প্রভৃতি ব্যাপার ও-সমস্তই কালিদাসের বানানো, কাব্যরচনারও একটা উপলক্ষমাত্র। ঐ ভারা

সূচিপত্র

বাঁধিয়া তিনি এই ইমারত গড়িয়াছেন; এখন আমরা ঐ ভারাটা ফেলিয়া দিব। আসল কথা, "রম্যাণি বীক্ষ্য মধুরাংশ নিশম্য শব্দান্' মন অকারণ বিরহে বিকল হইয়া উঠে, কালিদাস অন্যত্র তাহা স্বীকার করিয়াছেন। আষাঢ়র প্রথম দিনে অকস্মাৎ ঘনমেঘের ঘটা দেখিলে আমাদের মনে এক সৃষ্টিছাড়া বিরহ জাগিয়া উঠে, মেঘদূত সেই অকারণ বিরহের অমূলক প্রলাপ। তা যদি না হইত, তবে বিরহী মেঘকে ছাড়িয়া বিদ্যুৎকে দূত পাঠাইত। তবে পূর্বমেঘ এত রহিয়া বসিয়া, এত ঘুরিয়া ফিরিয়া, এত যূথীবন প্রফুল্ল করিয়া, এত জনপদবধূর উৎক্ষিপ্ত দৃষ্টির কটাক্ষপাত লুটিয়া লইয়া চলিত না।

কাব্য পড়িবার সময়ও যদি হিসাবের খাতা খুলিয়া রাখিতেই হয়, যদি কী লাভ করিলাম হাতে হাতে তাহার নিকাশ চুকাইয়া লইতেই হয়, তবে স্বীকার করিব মেঘদূত হইতে আমরা একটি তথ্য লাভ করিয়া পুলকিত হইয়াছি। সেটি এই যে, তখনো মানুষ ছিল এবং তখনো আষাঢ়র প্রথম দিন যথা-নিয়মে আসিত।

কিন্তু অসহিষ্ণু বররুচি যাঁহাদের প্রতি অশিষ্ট বিশেষণ প্রয়োগ করিয়াছেন তাঁহারা কি এরূপ লাভকে লাভ বলিয়াই গণ্য করিবেন? ইহাতে কি জ্ঞানের বিস্তার, দেশের উন্নতি, চরিত্রের সংশোধন ঘটিবে? অতএব, যাহা অকারণ যাহা অনাবশ্যক, হে চতুরানন, তাহা রসের কাব্যে রসিকদের জন্যই ঢাকা থাকুক–যাহা আবশ্যক, যাহা হিতকর, তাহার ঘোষণার বিরতি ও তাহার খরিদদারের অভাব হইবে না।

আশ্বিন, ১৩০৯

পনেরো-আনা

যে লোক ধনী, ঘরের চেয়ে তাহার বাগান বড়ো হইয়া থাকে। ঘর অত্যাবশ্যক; বাগান অতিরিক্ত, না হইলেও চলে। সম্পদের উদারতা অনাবশ্যকেই আপনাকে সপ্রমাণ করে। ছাগলের যতটুকু শিং আছে তাহাতে তাহার কাজ চলিয়া যায়, কিন্তু হরিণের শিঙের পনেরো-আনা অনাবশ্যকতা দেখিয়া আমরা মুগ্ধ হইয়া থাকি। ময়ুরের লেজ যে কেবল রঙচঙে জিতিয়াছে তাহা নহে, তাহার বাহুল্যগৌরবে শালিক-খঞ্জন-ফিঙার পুচ্ছ লজ্জায় অহরহ অস্থির।

যে মানুষ আপনার জীবনকে নিঃশেষে অত্যাবশ্যক করিয়া তুলিয়াছে সে ব্যক্তি আদর্শপুরুষ সন্দেহ নাই, কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে তাহার আদর্শ অধিক লোকে অনুসরণ করে না; যদি করিত তবে মনুষ্যসমাজ এমন একটি ফলের মতো হইয়া উঠিত যাহার বিচিই সমস্তটা, শাঁস একেবারেই নাই। কেবলই যে লোক উপকার করে তাহাকে ভালো না বলিয়া থাকিবার জো নাই; কিন্তু যে লোকটা বাহুল্য, মানুষ তাহাকে ভালোবাসে।

কারণ, বাহুল্যমানুষটি সর্বতোভাবেই আপনাকে দিতে পারে। পৃথিবীর উপকারী মানুষ কেবল উপকারের সংকীর্ণ দিক দিয়াই আমাদের একটা অংশকে স্পর্শ করে। সে আপনার উপকারিতার মহৎ প্রাচীরের দ্বারা আর-সকল দিকেই ঘেরা; কেবল একটি দরজা খোলা-সেখানে আমরা হাত পাতি, সে দান করে। আর, আমাদের বাহুল্যলোকটি কোনো কাজের নহে, তাই তাহার কোনো প্রাচীর নাই। সে আমাদের সহায় নহে, সে আমাদের সঙ্গীমাত্র। উপকারী লোকটির কাছ হইতে আমরা অর্জন করিয়া আনি এবং বাহুল্যলোকটির সঙ্গ মিলিয়া আমরা খরচ করিয়া থাকি। যে আমাদের খরচ করিবার সঙ্গী সে-ই আমাদের বন্ধু।

বিধাতার প্রসাদে হরিণের শিং ও ময়ূরের পুচ্ছের মতো সংসারে আমরা অধিকাংশ লোকই বাহুল্য, আমাদের অধিকাংশেরই জীবন জীবনচরিত লিখিবার যোগ্য নহে,

এবং সৌভাগ্যক্রমে আমাদের অধিকাংশেরই মৃত্যুর পরে পাথরের মূর্তি গড়িবার নিষ্ফল চেষ্টায় চাঁদার খাতা দ্বারে দ্বারে কাঁদিয়া ফিরিবে না।

মরার পরে অল্প লোকই অমর হইয়া থাকেন, সেইজন্যই পৃথিবীটা বাসযোগ্য হইয়াছে। ট্রেনের সব গাড়িই যদি রিজার্ভ গাড়ি হইত তাহা হইলে সাধারণ প্যাসেঞ্জারদের গতি কি হইত? একে তো বড়োলোকেরা একাই একশো-অর্থাৎ, যতদিন বাঁচিয়া থাকেন ততদিন অন্তত তাহাদের ভক্ত ও নিন্দুকের হৃদয়ক্ষেত্রে শতাধিক লোকের জায়গা জুড়িয়া থাকেন-তাহার পরে আবার মরিয়াও তাঁহারা স্থান ছাড়েন না। ছাড়া দূরে থাক, অনেকে মরার সুযোগ লইয়া অধিকার বিস্তার করিয়াই থাকেন। আমাদের একমাত্র রক্ষা এই যে, ইহাদের সংখ্যা অল্প। নহিলে কেবল সমাধিস্তম্ভে সামান্য ব্যক্তিদের কুটিরের স্থান থাকিত না। পৃথিবী এত সংকীর্ণ যে জীবিতের সঙ্গ জীবিতকে জায়গার জন্য লড়িতে হয়। জমির মধ্যেই হউক বা হৃদয়ের মধ্যই হউক, অন্য পাঁচজনের চেয়ে একটুখানি ফলাও অধিকার পাইবার জন্য কত লোকে জাল-জালিয়াতি করিয়া ইহকাল পরকাল খোয়াইতে উদ্যত। এই যে জীবিতে জীবিতে লড়াই ইহা সমকক্ষের লড়াই, কিন্তু মৃতের সঙ্গ জীবিতের লড়াই বড়ো কঠিন। তাহারা এখন সমস্ত দুর্বলতা, সমস্ত খন্ডতার অতীত; তাহারা কল্পলোকবিহারী-আমরা মাধ্যাকর্ষণ কৈশিকাকর্ষণ এবং বহুবিধ আকর্ষণ-বিকর্ষণের দ্বারা পীড়িত মর্তমানুষ, আমরা পারিয়া উঠিব কেন? এইজন্যই বিধাতা অধিকাংশ মৃতকেই বিস্মৃতলোকে নির্বাসন দিয়া থাকেন, সেখানে কাহারো স্থানাভাব নাই। বিধাতা যদি বড়ো বড়ো মৃতের আওতায় আমাদের মতো ছোটো ছোটো জীবিতকে নিতান্তই বিমর্ষ-মলিন, নিতান্তই কোণঘেঁষা করিয়া রাখিবেন, তবে পৃথিবীতে এমন উজ্জ্বল সুন্দর করিলেন কেন-মানুষের হৃদয়টুকু মানুষের কাছে এমন একান্তলোভনীয় হইল কী কারণে?

নীতিজ্ঞেরা আমাদিগকে নিন্দা করেন। বলেন, আমাদের জীবন বৃথা গেল। তাঁহারা আমাদিগকে তাড়না করিয়া বলিতেছেন-উঠ, জাগো, কাজ করো, সময় নষ্ট করিয়ো না।

কাজ না করিয়া অনেকে সময় নষ্ট করে সন্দেহ নাই; কিন্তু কাজ করিয়া যাহারা সময় নষ্ট করে তাহারা কাজও নষ্ট করে, সময়ও নষ্ট করে। তাহাদের পদভারে পৃথিবী কম্পান্বিত এবং তাহাদেরই সচষ্টতার হাত হইতে অসহায় সংসারকে রক্ষা করিবার জন্য ভগবান বলিয়াছেন, “সম্ভবামি যুগে যুগে।’

জীবন বৃথা গেল। বৃথা যাইতে দাও। অধিকাংশ জীবনই বৃথা যাইবার জন্য হইয়াছে। এই পনেরো-আনা অনাবশ্যক জীবনই বিধাতার ঐশ্বর্য সপ্রমাণ করিতেছে। তাঁহার জীবনভাণ্ডারে যে দৈন্য নাই, ব্যর্থপ্রাণ আমরাই তাহার অগণ্য সাক্ষী। আমাদের অফুরান অজস্রতা, আমাদের অহেতুক বাহুল্য দেখিয়া বিধাতার মহিমা স্মরণ করো। বাঁশি যেমন আপন শূন্যতার ভিতর দিয়া সংগীত প্রচার করে, আমরা সংসারের পনেরো-আনা আমাদের ব্যর্থতার দ্বারা বিধাতার গৌরব ঘোষণা করিতেছি। বুদ্ধ আমাদের জন্যই সংসার ত্যাগ করিয়াছেন, খৃস্ট আমাদের জন্য প্রাণ দিয়াছেন, ঋষিরা আমাদের জন্য তপস্যা করিয়াছেন, এবং সাধুরা আমাদের জন্য জাগ্রত রহিয়াছেন।

জীবন বৃথা গেল। যাইতে দাও। কারণ, যাওয়া চাই। যাওয়াটাই একটা সার্থকতা। নদী চলিতেছে–তাহার সকল জলই আমাদের স্নানে এবং পানে এবং আমন-ধানের ক্ষেতে ব্যবহার হইয়া যায় না। তাহার অধিকাংশ জলই কেবল প্রবাহ রাখিতেছে। আর-কোনো কাজ না করিয়া কেবল প্রবাহরক্ষা করিবার একটা বৃহৎ সার্থকতা আছে। তাহার যে জল আমরা খাল কাটিয়া পুকুরে আনি তাহাতে স্নান করা চলে, কিন্তু তাহা পান করি না; তাহার যে জল ঘটে করিয়া আনিয়া আমরা জালায় ভরিয়া রাখি তাহা পান করা চলে, কিন্তু তাহার উপরে আলোছায়ার উৎসব হয় না। উপকারকেই একমাত্র সাফল্য বলিয়া জ্ঞান করা কৃপণতার কথা, উদ্দেশ্যকেই একমাত্র পরিণাম বলিয়া গণ্য করা দীনতার পরিচয়।

আমরা সাধারণ পনেরো-আনা, আমরা নিজেদের যেন হেয় বলিয়া না জ্ঞান করি। আমরাই সংসারের গতি। পৃথিবীতে, মানুষের হৃদয়ে আমাদের জীবনস্বত্ব। আমরা কিছুতেই দখল রাখি না, আঁকড়িয়া থাকি না, আমরা চলিয়া যাই। সংসারের সমস্ত

কলগান আমাদের দ্বারা ধ্বনিত, সমস্ত ছায়ালোক আমাদের উপরেই স্পন্দমান। আমরা যে হাসি, কাঁদি, ভালোবাসি-বন্ধুর সঙ্গ অকারণ খেলা করি-স্বজনের সঙ্গ অনাবশ্যক আলাপ করি-দিনের অধিকাংশ সময়ই চারি পাশের লোকের সহিত উদ্দেশ্যহীনভাবে যাপন করি, তার পরে ধুম করিয়া ছেলের বিবাহ দিয়া তাহাকে আপিসে প্রবেশ করাইয়া পৃথিবীতে কোনো খ্যাতি না রাখিয়া মরিয়া পুড়িয়া ছাই হইয়া যাই-আমরা বিপুল সংসারের বিচিত্র তরঙ্গলীলার অঙ্গ; আমাদের ছোটোখাটো হাসিকৌতুকেই সমস্ত জনপ্রবাহ ঝল্‌মল্‌ করিতেছে; আমাদের ছোটোখাটো আলাপে বিলাপে সমস্ত সমাজ মুখরিত হইয়া আছে।

আমরা যাহাকে ব্যর্থ বলি প্রকৃতির অধিকাংশই তাই। সূর্যকিরণের বেশির ভাগ শূন্যে বিকীর্ণ হয়, গাছের মুকুল অতি অল্পই ফল পর্যন্ত টিঁকে। কিন্তু সে যাঁহার ধন তিনিই বুঝিবেন। সে ব্যয় অপব্যয় কি না বিশ্বকর্মার খাতা না দেখিলে তাহার বিচার করিতে পারি না। আমরাও তেমনি অধিকাংশই পরস্পরকে সঙ্গদান ও গতিদান ছাড়া আর-কোনো কাজে লাগি না; সেজন্য নিজেকে ও অন্যকে কোনো দোষ না দিয়া ছট্‌ফট্‌ না করিয়া, প্রফুল্ল হাস্যে ও প্রসন্ন গানে সহজেই অখ্যাত অবসানের মধ্যে যদি শান্তিলাভ করি তাহা হইলেই সেই উদ্দেশ্যহীনতার মধ্যেই যথার্থভাবে জীবনের উদ্দেশ্যসাধন করিতে পারি।

বিধাতা যদি আমাকে ব্যর্থ করিয়াই সৃষ্টি করিয়া থাকেন তবে আমি ধন্য; কিন্তু যদি উপদেষ্টার তাড়নায় আমি মনে করি আমাকে উপকার করিতেই হইবে, কাজে লাগিতেই হইবে, তবে যে উৎকট ব্যর্থতার সৃষ্টি করি, তাহা আমার স্বকৃত। তাহার জবাবদিহি আমাকে করিতে হইবে। পরের উপকার করিতে সকলেই জন্মাই নাই, অতএব উপকার না করিলে লজ্জা নাই। মিশনারী হইয়া চীন উদ্ধার করিতে না-ই গেলাম; দেশে থাকিয়া শেয়াল শিকার করিয়া ও ঘোড়দৌড়ে জুয়া খেলিয়া দিন-কাটানোকে যদি ব্যর্থতা বল, তবে তাহা চীন-উদ্ধার-চেষ্টার মতো এমন লোমহর্ষক নির্দারুণ ব্যর্থতা নহে।

সকল ঘাস ধান হয় না। পৃথিবীতে ঘাসই প্রায় সমস্ত, ধান অল্পই। কিন্তু ঘাস যেন আপনার স্বাভাবিক নিষ্ফলতা লইয়া বিলাপ না করে-সে যেন স্মরণ করে যে, পৃথিবীর শুষ্ক ধূলিকে সে শ্যামলতার দ্বারা আচ্ছন্ন করিতেছে, রৌদ্রতাপকে সে চির-প্রসন্ন স্নিগ্ধতার দ্বারা কোমল করিয়া লইতেছে। বোধকরি ঘাসজাতির মধ্যে কুশতৃণ গায়ের জোরে ধান্য হইবার চেষ্টা করিয়াছিল; বোধ করি সামান্য ঘাস হইয়া না থাকিবার জন্য, পরের প্রতি একান্ত মনোনিবেশ করিয়া জীবনকে সার্থক করিবার জন্য, তাহার মধ্যে অনেক উত্তেজনা জন্মিয়াছিল; তবু সে ধান্য হইল না। কিন্তু সর্বদা পরের প্রতি তাহার তীক্ষ্ণ লক্ষ্য নিবিষ্ট করিবার একাগ্র চেষ্টা কিরূপ তাহা পরই বুঝিতেছে। মোটের উপর এ কথা বলা যাইতে পারে যে, এরূপ উগ্র পর-পরায়ণতা বিধাতার অভিপ্রেত নহে। ইহা অপেক্ষা সাধারণ তৃণের খ্যাতিহীন স্নিগ্ধ-সুন্দর বিনম্র-কোমল নিষ্ফলতা ভালো।

সংক্ষেপে বলিতে গেলে মানুষ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত–পনেরো-আনা এবং বাকী এক-আনা। পনেরো-আনা শান্ত এবং এক-আনা অশান্ত। পনেরো-আনা অনাবশ্যক এবং এক-আনা আবশ্যক। বাতাসে চলনশীল জ্বলনধর্মী অক্সিজেনের পরিমাণ অল্প, স্থির শান্ত নাইট্রোজেনই অনেক। যদি তাহার উল্‌টা হয় তবে পৃথিবী জ্বলিয়া ছাই হয়। তেমনি সংসারে, যখন কোনো এক-দল পনেরো-আনা এক-আনার মতোই অশান্ত ও আবশ্যক হইয়া উঠিবার উপক্রম করে তখন জগতে আর কল্যাণ নাই, তখন যাহাদের অদৃষ্টে মরণ আছে তাহাদিগকে মরিবার জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে।

মাঘ, ১৩০৯

নববর্ষা

যৌবনে নিজের অন্ত পাই নাই, সংসারেও অন্ত ছিল না। আমি কী যে হইব না হইব, কী করিতে পারি না পারি, কাজে ভাবে অনুভাবে আমার প্রকৃতির দৌড় কতদূর, তাহা নির্দিষ্ট হয় নাই, সংসারও অনির্দিষ্ট রহস্যপূর্ণ ছিল। এখন নিজের সম্বন্ধে সকল সম্ভাবনার সীমায় আসিয়া পৌঁছিয়াছি, পৃথিবীও সেইসঙ্গ সংকুচিত হইয়া গেছে। এখন ইহা আমরাই আপিস-ঘর বৈঠকখানা-দরদালানের শামিল হইয়া পড়িয়াছে। সেইভাবেই পৃথিবী এত বেশি অভ্যস্ত পরিচিত হইয়া গেছে যে ভুলিয়া গেছি এমন কত আপিস-ঘর বৈঠকখানা দরদালান ছায়ার মতো এই পৃথিবীর উপর দিয়া গেছে, ইহাতে চিহ্নও রাখিতে পারে নাই। কত প্রৌঢ় নিজের মামলা-মকদ্দমার মন্ত্রগৃহকেই পৃথিবীর ধ্রুব কেন্দ্রস্থল গণ্য করিয়া তাকিয়ার উপর ঠেসান দিয়া বসিয়া ছিল, তাহাদের নাম তাহাদের ভস্মের সঙ্গ সঙ্গ বাতাসে উড়িয়া গেছে, সে এখন আর খুঁজিয়া পাইবার জো নাই–তবু পৃথিবী সমান বেগে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করিয়া চলিতেছে।

কিন্তু আষাঢ়র মেঘ প্রতি বৎসর যখনই আসে তখনই তাহার নতুনত্বে রসাক্রান্ত ও পুরাতনত্বে পুঞ্জীভূত হইয়া আছে। তাহাকে আমরা ভুল করি না, কারণ সে আমাদের ব্যবহারের বাহিরে থাকে। আমার সংকোচের সঙ্গ সে সংকুচিত হয় না। যখন বন্ধুর দ্বারা বঞ্চিত, শত্রুর দ্বারা পীড়িত, দুরদৃষ্টের দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হইয়াছি, তখন যে কেবল হৃদয়ের মধ্যে বেদনার চিহ্ন লাগিয়াছে, ললাটের উপর বলি অঙ্কিত হইয়াছে, তাহা নহে-যে পৃথিবী আমার চারি দিকে স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া আছে, আমার আঘাতের দাগ তাহার উপর পড়িয়াছে। তাহার জলস্থল আমার বেদনায় বিক্ষত, আমার দুশ্চিন্তায় চিহ্নিত। আমার উপর যখন অস্ত্র আসিয়া পড়িয়াছে তখন আমার চারিদিকের পৃথিবী সরিয়া দাঁড়ায় নাই; শর আমাকে ভেদ করিয়া তাহাকে বিদ্ধ করিয়াছে। এমনি করিয়া বারংবার আমার সুখদুঃখের ছাপ লাগিয়া পৃথিবীটা আমারই বলিয়া চিহ্নিত হইয়া গেছে।

সূচিপত্র

মেঘে আমার কোনো চিহ্ন নাই। সে পথিক, আসে যায়, থাকে না। আমার জরা তাহাকে স্পর্শ করিবার অবকাশ পায় না। আমার আশানৈরাশ্য হইতে সে বহুদূরে।

এইজন্য, কালিদাস উজ্জয়িনীর প্রাসাদশিখর হইতে যে আষাঢ়ের মেঘ দেখিয়াছিলেন আমরাও সেই মেঘ দেখিয়াছি, ইতিমধ্যে পরিবর্তমান মানুষের ইতিহাস তাহাকে স্পর্শ করে নাই। কিন্তু সে অবন্তী, সে বিদিশা কোথায়? মেঘদূতের মেঘ প্রতিবৎসর চিরনূতন চিরপুরাতন হইয়া দেখা দেয়-বিক্রমাদিত্যের যে উজ্জয়িনী মেঘের চেয়ে দৃঢ় ছিল, বিনষ্ট স্বপ্নের মতো তাহাকে আর ইচ্ছা করিলে গড়িবার জো নাই।

মেঘ দেখিলে "সুখিনোহপ্যন্যথাবৃত্তিচেতঃ', সুখীলোকেরও আনমনা ভাব হয়, এইজন্যই। মেঘ মনুষ্যলোকের কোনো ধার ধারে না বলিয়া, মানুষকে অভ্যস্ত গণ্ডির বাহিরে লহিয়া যায়। মেঘের সঙ্গ প্রতিদিনের চিন্তা-চেষ্টা-কাজকর্মের কোনো সম্বন্ধ নাই বলিয়া সে আমাদের মনকে ছুটি দেয়। মন তখন বাঁধন মানিতে চাহে না, প্রভুশাপে নির্বাসিত যক্ষের বিরহ তখন উদ্দাম হইয়া উঠে। প্রভুভৃত্যের সম্বন্ধ, সংসারের সম্বন্ধ; মেঘ সংসারের এই-সকল প্রয়োজনীয় সম্বন্ধগুলাকে ভুলাইয়া দেয়, তখনই হৃদয় বাঁধ ভাঙিয়া আপনার পথ বাহির করিতে চেষ্টা করে।

মেঘ আপনার নিত্যনূতন চিত্রবিন্যাসে, অন্ধকারে, গর্জনে, বর্ষণে, চেনা পৃথিবীর উপর একটা প্রকাণ্ড অচেনার আভাস নিক্ষপ করে; একটা বহুদূরকালের এবং বহুদূরদেশের নিবিড় ছায়া ঘনাইয়া তোলে; তখন পরিচিত পৃথিবীর হিসাবে যাহা অসম্ভব ছিল তাহা সম্ভবপর বলিয়া বোধ হয়। কর্মপাশবদ্ধ প্রিয়তম যে আসিতে পারে না, পথিকবধূ তখন এ কথা আর মানিতে চাহে না। সংসারের কঠিন নিয়ম সে জানে, কিন্তু জ্ঞানে জানে মাত্র; সে নিয়ম যে এখনো বলবান আছে, নিবিড় বর্ষার দিনে এ কথা তাহার হৃদয়ে প্রতীতি হয় না।

সেই কথাই ভাবিতেছিলাম-ভোগের দ্বারা এই বিপুল পৃথিবী, এই চিরকালের পৃথিবী, আমার কাছে খর্ব হইয়া গেছে। আমি তাহাকে যতটুকু পাইয়াছি তাহাকে

ততটুকু বলিয়াই জানি, আমার ভোগের বাহিরে তাহার অস্তিত্ব আমি গণ্যই করি না। জীবন শক্ত হইয়া বাঁধিয়া গেছে, সঙ্গ সঙ্গ সে নিজের আবশ্যক পৃথিবীটুকুকে টানিয়া আঁটিয়া লইয়াছে। নিজের মধ্যে এবং নিজের পৃথিবীর মধ্যে এখন আর কোনো রহস্য দেখিতে পাই না বলিয়াই শান্ত হইয়া আছি; নিজেকে সম্পূর্ণ জানি মনে করি এবং নিজের পৃথিবীটুকুকেও সম্পূর্ণ জানিয়াছি বলিয়া স্থির করিয়াছি। এমন সময় পূর্বদিগন্ত স্নিগ্ধ অন্ধকারে আচ্ছন্ন করিয়া কোথা হইতে সেই শত-শতাব্দী পূর্বেকার কালিদাসের মেঘ আসিয়া উপস্থিত হয়। সে আমার নহে, আমার পৃথিবীটুকুর নহে; সে আমাকে কোন্ অলকাপুরীতে, কোন্ চিরযৌবনের রাজ্যে, চিরবিচ্ছেদের বেদনায়, চিরমিলনের আশ্বাসে, চিরসৌন্দর্যের কৈলাসপুরীর পথচিহ্নহীন তীর্থাভিমুখে আকর্ষণ করিতে থাকে। তখন পৃথিবীর যেটুকু জানি সেটুকু তুচ্ছ হইয়া যায়, যাহা জানিতে পারি নাই তাহাই বড়ো হইয়া উঠে, যাহা পাইলাম না তাহাকেই লব্ধ জিনিসের চেয়ে বেশি সত্য মনে হইতে থাকে । জানিতে পারি, আমার জীবনে আমার শক্তিতে অতি অল্পই অধিকার করিতে পারিয়াছি, যাহা বৃহৎ তাহাকে স্পর্শও করি নাই।

আমার নিত্যকর্মক্ষেত্রকে, নিত্যপরিচিত সংসারকে, আচ্ছন্ন করিয়া দিয়া সজলমেঘ-মেদুর পরিপূর্ণ নববর্ষা আমাকে অজ্ঞাত ভাবলোকের মধ্যে সমস্ত বিধিবিধানের বাহিরে একেবারে একাকী দাঁড় করাইয়া দেয়; পৃথিবীর এই কয়টা বৎসর কাড়িয়া লইয়া আমাকে একটি প্রকাণ্ড পরমায়ুর বিশালত্বের মাঝখানে স্থাপন করে; আমাকে রামগিরি-আশ্রমের জনশূন্য শৈলশৃঙ্গর শিলাতলে সঙ্গীহীন ছাড়িয়া দেয়। সেই নির্জন শিখর এবং আমার কোনো এক চিরনিকেতন, অন্তরাত্মার চিরগম্যস্থান, অলকাপুরীর মাঝখানে একটি সুবৃহৎ সুন্দর পৃথিবী পড়িয়া আছে মনে পড়ে; নদীকলধ্বনিত সানুমৎপর্বতবন্ধুর জম্বুকুঞ্জচ্ছায়ান্ধকার নববারিসিঞ্চিতযূথীসুগন্ধি একটি বিপুল পৃথিবী। হৃদয় সেই পৃথিবীর বনে বনে গ্রামে গ্রামে শৃঙ্গ শৃঙ্গ নদীর কূলে কূলে ফিরিতে ফিরিতে,অপরিচিত সুন্দরের পরিচয় লইতে লইতে, দীর্ঘ বিরহের শেষ মোক্ষস্থানে যাইবার জন্য মানসোৎক হংসের ন্যায় উৎসুক হইয়া উঠে।

মেঘদূত ছাড়া নববর্ষার কাব্য কোনো সাহিত্যে কোথাও নাই। ইহাতে বর্ষার সমস্ত অন্তর্বেদনা নিত্যকালের ভাষায় লিখিত হইয়া গেছে। প্রকৃতির সাংবৎসরিক মেঘোৎসবের অনির্বচনীয় কবিত্বগাথা মানবের ভাষায় বাঁধা পড়িয়াছে।

পূর্বমেঘে বৃহৎ পৃথিবী আমাদের কল্পনার কাছে উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে। আমরা সম্পন্ন গৃহস্থটি হইয়া আরামে সন্তোষে অর্ধনিমীলিতলোচনে যে গৃহটুকুর মধ্যে বাস করিতেছিলাম, কালিদাসের মেঘ "আষাঢ়স্য প্রথমদিবসে' হঠাৎ আসিয়া আমাদিগকে সেখান হইতে ঘরছাড়া করিয়া দিল। আমাদের গোয়াল ঘর-গোলাবাড়ির বহু দূরে যে আবর্ত-চঞ্চলা নর্মদা ভ্রুকুটি রচনা করিয়া চলিয়াছে, যে চিত্রকূটের পাদকুঞ্জ প্রফুল্ল নবনীপে বিকশিত, উদয়নকথাকোবিদ গ্রামবৃদ্ধদের দ্বারের নিকটে যে চৈত্যবট শুককাকলীতে মুখর, তাহাই আমাদের পরিচিত ক্ষুদ্র সংসারকে নিরস্ত করিয়া বিচিত্র সৌন্দর্যের চিরসত্যে উদ্‌ভাসিত হইয়া দেখা দিয়াছে।

বিরহীর ব্যগ্রতাতেও কবি পথসংক্ষেপ করেন নাই। আষাঢ়ের নীলাভ মেঘচ্ছায়াবৃত নগ-নদী নগর-জনপদের উপর দিয়া রহিয়া রহিয়া ভাবাবিষ্ট অলসগমনে যাত্রা করিয়াছেন। যে তাহার মুগ্ধ নয়নকে অভ্যর্থনা করিয়া ডাকিয়াছে তিনি তাহাকে আর "না' বলিতে পারেন নাই। পাঠকের চিত্তকে কবি বিরহের বেগে বাহির করিয়াছেন, আবার পথের সৌন্দর্য মন্থর করিয়া তুলিয়াছেন। যে চরম স্থানে মন ধাবিত হইতেছে তাহার সুদীর্ঘ পথটিও মনোহর, সে পথকে উপেক্ষা করা যায় না।

বর্ষায় অভ্যস্ত পরিচিত সংসার হইতে বিক্ষিপ্ত হইয়া মন বাহিরের দিকে যাইতে চায়, পূর্ব-মেঘে কবি আমাদের সেই আকাঙক্ষাকে উদ্‌বেলিত করিয়া তাহারই কলগান জাগাইয়াছেন, আমাদিগকে মেঘের সঙ্গী করিয়া অপরিচিত পৃথিবীর মাঝখান দিয়া লইয়া চলিয়াছেন। সে পৃথিবী "অনাঘ্রাতং পুষ্পম্' তাহা আমাদের প্রাত্যহিক ভোগের দ্বারা কিছুমাত্র মলিন হয় নাই, সে পৃথিবীতে আমাদের পরিচয়ের প্রাচীর দ্বারা কল্পনা কোনোখানে বাধা পায় না। যেমন এই মেঘ তেমনি সেই পৃথিবী। আমার এই সুখদুঃখ-ক্লান্তি-অবসাদের জীবন তাহাকে কোথাও স্পর্শ করে

নাই। প্রৌঢ়বয়সের নিশ্চয়তা বেড়া দিয়া, ঘের দিয়া, তাহাকে নিজের বাস্তুবাগানের অন্তরর্ভুক্ত করিয়া লয় নাই।

অজ্ঞাত নিখিলের সহিত নবীন পরিচয়, এই হইল পূর্বমেঘ। নবমেঘের আর-একটি কাজ আছে। সে আমাদের চারি দিকে একটি পরমনিভৃত পরিবেষ্টন রচনা করিয়া "জননান্তরসৌহৃদানি' মনে করাইয়া দেয়, অপরূপ সৌন্দর্যলোকের মধ্যে কোনো-একটি চিরজ্ঞাত চিরপ্রিয়ের জন্য মনকে উতলা করিয়া তোলে।

পূর্বমেঘে বহুবিচিত্রর সহিত সৌন্দর্যের পরিচিত এবং উত্তরমেঘে সেই একের সহিত আনন্দের সম্মিলন। পৃথিবীতে বহুর মধ্য দিয়া সেই সুখের যাত্রা, এবং স্বর্গলোকে একের মধ্যে সেই অভিসারের পরিণাম।

নববর্ষার দিনে এই বিষয়কর্মের ক্ষুদ্র সংসারকে কে না বলিবে নির্বাসন। প্রভুর অভিশাপেই এখানে আটকা পড়িয়া আছি। মেঘ আসিয়া বাহিরে যাত্রা করিবার জন্য আহ্বান করে, তাহাই পূর্বমেঘের গান; এবং যাত্রার অবসানে চিরমিলনের জন্য আশ্বাস দেয়, তাহাই উত্তরমেঘের সংবাদ।

সকল কবির কাব্যেরই গূঢ় অভ্যন্তরে এই পূর্বমেঘ ও উত্তরমেঘ আছে। সকল বড়ো কাব্যই আমাদিগকে বৃহতের মধ্যে আহ্বান করিয়া আনে ও নিভৃতের দিকে নির্দেশ করে। প্রথমে বন্ধন ছেদন করিয়া বাহির করে, পরে একটি ভূমার সহিত বাঁধিয়া দেয়। প্রভাতে পথে লইয়া আসে, সন্ধ্যায় ঘরে লইয়া যায়। একবার তানের মধ্যে আকাশ-পাতাল ঘুরাইয়া সমের মধ্যে পূর্ণ আনন্দে দাঁড় করাইয়া দেয়।

যে কবির তান আছে, কিন্তু কোথাও সম নাই–যাহার মধ্যে কেবল উদ্যম আছে, আশ্বাস নাই–তাহার কবিত্ব উচ্চকাব্যশ্রেণীতে স্থায়ী হইতে পারে না। শেষের দিকে একটা কোথাও পৌঁছাইয়া দিতে হইবে, এই ভরসাতেই আমরা আমাদের চিরাভ্যস্ত সংসারের বাহির হইয়া কবির সহিত যাত্রা করি; পুষ্পিত পথের মধ্যে দিয়া আনিয়া হঠাৎ একটা শূন্যগহ্বরের ধারের কাছে ছাড়িয়া দিলে বিশ্বাসঘাতকতা করা হয়। এইজন্য কোনো কবির কাব্য পড়িবার সময় আমরা এই দুটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা

করি,তাঁহার পূর্বমেঘ আমাদিগকে কোথায় বাহির করে এবং উত্তরমেঘ কোন্ সিংহদ্বারের সম্মুখে আনিয়া উপনীত করে।

শ্রাবণ, ১৩০৮

পরনিন্দা

পরনিন্দা পৃথিবীতে এত প্রাচীন এবং এত ব্যাপক যে, সহসা ইহার বিরুদ্ধে একটা যে-সে মত প্রকাশ করা ধৃষ্টতা হইয়া পড়ে।

নোনা জল পানের পক্ষে উপযোগী নহে এ কথা শিশুও জানে-কিন্তু যখন দেখি সাত সমুদ্রের জল নুনে পরিপূর্ণ, যখন দেখি এই নোনা জল সমস্ত পৃথিবীকে বেড়িয়া আছে, তখন এ কথা বলিতে কোনো মতেই সাহস হয় না যে, সমুদ্রের জলে নুন না থাকিলেই ভালো হইত। নিশ্চয়ই ভালো হইত না, হয়তো লবণ জলের অভাবে সমস্ত পৃথিবী পচিয়া উঠিত।

তেমনি পরনিন্দা সমাজের কণায় কণায় যদি মিশিয়া না থাকিত তবে নিশ্চয়ই একটা বড়ো রকমের অনর্থ ঘটিত। উহা লবণের মতো সমস্ত সংসারকে বিকার হইতে রক্ষা করিতেছে।

পাঠক বলিবেন, “বুঝিয়াছি! তুমি যাহা বলিতে চাও, তাহা অত্যন্ত পুরাতন। অর্থাৎ, নিন্দার ভয়ে সমাজ প্রকৃতিস্থ হইয়া আছে।”

একথা যদি পুরাতন হয় তবে আনন্দের বিষয়। আমি তো বলিয়াছি, যাহা পুরাতন তাহা বিশ্বাসের যোগ্য।

বস্তুত নিন্দা না থাকিলে পৃথিবীতে জীবনের গৌরব কী থাকিত? একটা ভালো কাজে হাত দিলাম, তাহার নিন্দা কেহ করে না, সে ভালো কাজের দাম কী! একটা ভালো কিছু লিখিলাম,তাহার নিন্দুক কেহ নাই, ভালো গ্রন্থের পক্ষে এমন মর্মান্তিক অনাদর কী হইতে পারে! জীবনকে ধর্মচর্চায় উৎসর্গ করিলাম, যদি কোনো লোক তাহার মধ্যে গূঢ় মন্দ অভিপ্রায় না দেখিল তবে সাধুতা যে নিতান্তই সহজ হইয়া পড়িল।

সূচিপত্র

মহত্বকে পদে পদে নিন্দার কাঁটা মাড়াইয়া চলিতে হয়। ইহাতে যে হার মানে বীরের সদ্‌গতি সে লাভ করে না। পৃথিবীতে নিন্দা দোষীকে সংশোধন করিবার জন্য আছে তাহা নহে, মহত্বকে গৌরব দেওয়া তাহার একটা মস্ত কাজ।

নিন্দা-বিরোধ গায়ে বাজে না, এমন কথা অল্প লোকই বলিতে পারে। কোনো সহৃদয় লোক তো বলিতে পারে না। যাহার হৃদয় বেশি তাহার ব্যথা পাইবার শক্তিও বেশি। যাহার হৃদয় আছে সংসারে সেই লোকই কাজের মতো কাজে হাত দেয়। আবার লোকের মতো লোক এবং কাজের মতো কাজ দেখিলেই নিন্দার ধার চারগুণ শাণিত হইয়া উঠে। ইহাতেই দেখা যায়, বিধাতা যেখানে অধিকার বেশি দিয়াছেন সেইখানেই দুঃখ এবং পরীক্ষা অত্যন্ত কঠিন করিয়াছেন। বিধাতার সেই বিধানই জয়ী হউক। নিন্দা দুঃখ বিরোধ যেন ভালো লোকের, গুণী লোকের ভাগ্যেই বেশি করিয়া জোটে। যে যথার্থরূপে ব্যথা ভোগ করিতে জানে সে'ই যেন ব্যথা পায়। অযোগ্য ক্ষুদ্র ব্যক্তির উপরে যেন নিন্দা-বেদনার অনাবশ্যক অপব্যয় না হয়।

সরলহৃদয় পাঠক পুনশ্চ বলিবেন, "জানি, নিন্দায় উপকার আছে। যে লোক দোষ করে তাহার দোষকে ঘোষণা করা ভালো; কিন্তু যে করে না তাহার নিন্দায় সংসারে ভালো হইতেই পারে না। মিথ্যা জিনিসটা কোনো অবস্থাতেই ভালো নয়।"

এ হইলে তো নিন্দা টিঁকে না। প্রমাণ লইয়া দোষীকে দোষী সাব্যস্ত করা, সে তো হইল বিচার। সে গুরুভার কয়জন লইতে পারে, এবং এত সময়ই বা কাহার হাতে আছে? তাহা ছাড়া পরের সম্বন্ধে এত অতিরিক্ত মাত্রায় কাহারো গরজ নাই। যদি থাকিত তবে পরের পক্ষে তাহা একেবারেই অসহ্য হইত। নিন্দুককে সহ্য করা যায়, কারণ, তাহার নিন্দুকতাকে নিন্দা করিবার সুখ আমারও হাতে আছে; কিন্তু বিচারককে সহ্য করিবে কে?

বস্তুত আমরা অতি সামান্য প্রমাণেই নিন্দা করিয়া থাকি, নিন্দার সেই লাঘবতাটুকু না থাকিলে সমাজের হাড় গুঁড়া হইয়া যাইত। নিন্দার রায় চূড়ান্ত রায় নহে; নিন্দিত

ব্যক্তি ইচ্ছা করিলে তাহার প্রতিবাদ না করিতেও পারে। এমন-কি, নিন্দাবাক্য হাসিয়া উড়াইয়া দেওয়াই সুবুদ্ধি বলিয়া গণ্য। কিন্তু নিন্দা যদি বিচারকের রায় হইত তবে সুবুদ্ধিকে উকিল-মোক্তারের শরণ লইতে হইত। যাঁহারা জানেন তাঁহারা স্বীকার করিবেন, উকিল-মোক্তারের সহিত কারবার হাসির কথা নহে। অতএব দেখা যাইতেছে, সংসারের প্রয়োজন হিসাবে নিন্দার যতটুকু গুরুত্ব আবশ্যক তাহাও আছে, যতটুকু লঘুত্ব থাকা উচিত তাহারও অভাব নাই।

পূর্বে যে পাঠকটি আমার কথায় অসহিষ্ণু হইয়া উঠিয়াছিলেন তিনি নিশ্চয়ই বলিবেন,”তুচ্ছ অনুমানের উপরেই হউক বা নিশ্চিত প্রমাণের উপরেই হউক, নিন্দা যদি করিতেই হয় তবে ব্যথার সহিত করা উচিত-নিন্দায় সুখ পাওয়া উচিত নহে।”

এমন কথা যিনি বলিবেন তিনি নিশ্চয়ই সহৃদয় ব্যক্তি। সুতরাং তাঁহার বিবেচনা করিয়া দেখা উচিত-নিন্দায় নিন্দিত ব্যক্তি ব্যথা পায়, আবার নিন্দুকও যদি বেদনা বোধ করে, তবে সংসারে দুঃখবেদনার পরিমাণ কিরূপ অপরিমিতরূপে বাড়িয়া উঠে। তাহা হইলে নিমন্ত্রণসভা নিস্তব্ধ, বন্ধুসভা বিষাদে ম্রিয়মান, সমালোচকের চক্ষু অশ্রুপ্লুত এবং তাঁহার পাঠকগণের হৃদ্‌গহ্বর হইতে দীর্ঘশ্বাস ঘন ঘন উচ্ছ্বসিত। আশা করি, শনিগ্রহের অধিবাসীদেরও এমন দশা নয়।

তাছাড়া সুখও পাইব না অথচ নিন্দা করিব, এমন ভয়ংকর নিন্দুক মনুষ্যজাতিও নহে। মানুষকে বিধাতা এতই সৌখিন করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন যে, যখন সে নিজের পেট ভরাইয়া প্রাণরক্ষা করিতে যাইতেছে তখনো ক্ষুধানিবৃত্তির ও রুচিপরিতৃপ্তির যে সুখ সেটুকুও তাহার চাই-সেই মানুষ ট্রাম ভাড়া করিয়া বন্ধুর বাড়ি গিয়া পরের নিন্দা করিয়া আসিবে অথচ তাহাতে সুখ পাইবে না, যে ধর্মনীতি এমন অসম্ভব প্রত্যাশা করে তাহা পূজনীয়, কিন্তু পালনীয় নহে।

আবিষ্কার-মাত্রেরই মধ্যে সুখের অংশ আছে। শিকার কিছুমাত্র সুখের হইত না, যদি মৃগ যেখানে-সেখানে থাকিত এবং ব্যাধকে দেখিয়া পলাইয়া না যাইত। মৃগের

উপরে আমাদের আক্রোশ আছে বলিয়াই যে তাহাকে মারি তাহা নহে, সে বেচারা গহন বনে থাকে এবং পলায়নপটু বলিয়া তাহাকে কাজেই মারিতে হয়।

মানুষের চরিত্র, বিশেষত তাহার দোষগুলি, ঝোপঝাপের মধ্যেই থাকে এবং পায়ের শব্দ শুনিলেই দৌড় মারিতে চায়, এইজন্যই নিন্দার এত সুখ। আমি নাড়ী-নক্ষত্র জানি, আমার কাছে কিছুই গোপন নাই, নিন্দুকের মুখে এই কথা শুনিলেই বোঝা যায়, সে ব্যক্তি জাত-শিকারি। তুমি তোমার যে অংশটা দেখাইতে চাও না আমি সেইটাকেই তাড়াইয়া ধরিয়াছি। জলের মাছকে আমি ছিপ ফেলিয়া ধরি, আকাশের পাখিকে বাণ মারিয়া পাড়ি, বনের পশুকে জাল পাতিয়া বাঁধি–ইহা কত সুখের! যাহা লুকায় তাহাকে বাহির করা, যাহা পালায় তাহাকে বাঁধা, ইহার জন্য মানুষ কী না করে!

দুর্লভতার প্রতি মানুষের একটা মোহ আছে। সে মনে করে যাহা সুলভ তাহা খাঁটি নহে, যাহা উপরে আছে তাহা আবরণমাত্র, যাহা লুকাইয়া আছে তাহাই আসল। এইজন্যই গোপনের পরিচয় পাইলে সে আর-কিছু বিচার না করিয়া প্রকৃতের পরিচয় পাইলাম বলিয়া হঠাৎ খুশি হইয়া উঠে। এ কথা সে মনে করেন যে, উপরের সত্যের চেয়ে নীচের সত্য যে বেশি সত্য তাহা নহে; এ কথা তাহাকে বোঝানো শক্ত যে, সত্য যদি বাহিরে থাকে তবুও তাহা সত্য এবং ভিতরে যেটা আছে সেটা যদি সত্য না হয় তবে তাহা অসত্য। এই মোহবশতই কাব্যের সরল সৌন্দর্য অপেক্ষা তাহার গভীর তত্ত্বকে পাঠক অধিক সত্য বলিয়া মনে করিতে ভালোবাসে এবং বিজ্ঞ লোকেরা নিশাচর পাপকে আলোকচর সাধুতার অপেক্ষা বেশি বাস্তব বলিয়া তাহার গুরুত্ব অনুভব করে। এইজন্য মানুষের নিন্দা শুনিলেই মনে হয় তাহার প্রকৃত পরিচয় পাওয়া গেল। পৃথিবীতে অতি অল্প লোকের সঙ্গই আমাকে ঘরকন্না করিতে হয়, অথচ এত-শত লোকের প্রকৃত পরিচয় লইয়া লাভটা কী? কিন্তু প্রকৃত পরিচয়ের জন্য ব্যগ্রতা মানুষের স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম, সেটা মনুষ্যত্বের প্রধান অঙ্গ, অতএব তাহার সঙ্গ বিবাদ করা চলে না; কেবল যখন দুঃখ করিবার দীর্ঘ অবকাশ পাওয়া যায় তখন এই ভাবি যে, যাহা সুন্দর, যাহা সম্পূর্ণ, যাহা ফুলের মতো বাহিরে বিকশিত হইয়া দেখা দেয়, তাহা বাহিরে আসে বলিয়াই বুদ্ধিমান

মানুষ ঠকিবার ভয়ে তাহাকে বিশ্বাস করিয়া তাহাতে সম্পূর্ণ আনন্দ ভোগ করিতে সাহস করে না। ঠকাই কি সংসারে চরম ঠকা? না-ঠকাই কি চরম লাভ?

কিন্তু এ-সকল বিষয়ের ভার আমার উপরে নাই, মনুষ্যচরিত্র আমি জন্মিবার বহু পূর্বেই তৈরি হইয়া গেছে। কেবল এই কথাটা আমি বুঝিবার ও বুঝাইবার চষ্টায় ছিলাম যে সাধারণত মানুষ নিন্দা করিয়া যে সুখ পায় তাহা বিদ্বেষের সুখ নহে। বিদ্বেষ কখনোই সাধারণভাবে সুখকর হইতে পারে না এবং বিদ্বেষ সমস্ত সমাজের স্তরে স্তরে পরিব্যপ্ত হইলে যে বিষ হজম করা সমাজের অসাধ্য। আমরা বিস্তর ভালো লোক নিরীহ লোককেও নিন্দা করিতে শুনিয়াছি; তাহার কারণ এমন নহে যে সংসারে ভালো লোক, নিরীহ লোক নাই-তাহার কারণ এই যে, সাধারণত নিন্দার মূল প্রস্রবণটা মন্দভাব নয়।

কিন্তু বিদ্বেষমূলক নিন্দা সংসারে একেবারেই নাই, একথা লিখিতে গেলে সত্যযুগের জন্য অপেক্ষা করিতে হয়। তবে সে নিন্দা সম্বন্ধে অধিক কথা বলিবার নাই। কেবল প্রার্থনা এই যে, এরূপ নিন্দা যাহার স্বভাবসিদ্ধ সেই দুর্ভাগাকে যেন দয়া করিতে পারি।

অগ্রহায়ণ, ১৩০৯

বসন্তযাপন

এই মাঠের পারে শালবনের নূতন কচি পাতার মধ্য দিয়া বসন্তের হাওয়া দিয়াছে।

অভিব্যক্তির ইতিহাসে মানুষের একটা অংশ তো গাছপালার সঙ্গ জড়ানো আছে। কোনো এক সময়ে আমরা যে শাখামৃগ ছিলাম, আমাদের প্রকৃতিতে তাহার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু তাহারও অনেক আগে কোনো এক আদিযুগে আমরা নিশ্চয়ই শাখী ছিলাম, তাহা কি ভুলিতে পারিয়াছি? সেই আদিকালের জনহীন মধ্যাহ্নে আমাদের ডালপালার মধ্যে বসন্তের বাতাস কাহাকেও কোনো খবর না দিয়া যখন হঠাৎ হু হু করিয়া আসিয়া পড়িত, তখন কি আমরা প্রবন্ধ লিখিয়াছি না দেশের উপকার করিতে বাহির হইয়াছি? তখন আমরা সমস্তদিন খাঁড়া দাঁড়াইয়া মূকের মতো মূঢ়ের মতো কাঁপিয়াছি; আমাদের সর্বাঙ্গ ঝর্‌ঝর্‌ মর্‌মর্‌ করিয়া পাগলের মতো গান গাহিয়াছে; আমাদের শিকড় হইতে আরম্ভ করিয়া প্রশাখাগুলির কচি ডগা পর্যন্ত রসপ্রবাহে ভিতরে ভিতরে চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। সেই আদিকালের ফাল্গুন-চৈত্র এমনতরো রসে-ভরা আলস্যে এবং অর্থহীন প্রলাপেই কাটিয়া যাইত। সেজন্য কাহারো কাছে কোনো জবাবদিহি ছিল না।

যদি বল অনুতাপের দিন তাহার পরে আসিত, বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠের খরা চুপ করিয়া মাথা পাতিয়া লইতে হইত, সে কথা মানি। যেদিনকার যাহা সেদিনকার তাহা এমনি করিয়াই গ্রহণ করিতে হয়। রসের দিনে ভোগ, দাহের দিনে ধৈর্য যদি সহজে আশ্রয় করা যায়, তবে সান্ত্বনার বর্ষাধারা যখন দশদিক পূর্ণ করিয়া ঝরিতে আরম্ভ করে তখন তাহা মজ্জায় মজ্জায় পুরাপুরি টানিয়া লইবার সামর্থ্য থাকে।

কিন্তু এ-সব কথা বলিবার অভিপ্রায় আমার ছিল না। লোকে সন্দেহ করিতে পারে, রূপক আশ্রয় করিয়া আমি উপদেশ দিতে বসিয়াছি। সন্দেহ একেবারেই অমূলক বলা যায় না। অভ্যাস খারাপ হইয়া গেছে।

আমি এই বলিতেছিলাম যে, অভিব্যক্তির শেষকোঠায় আসিয়া পড়াতে মানুষের মধ্যে অনেক ভাগ ঘটিয়াছে। জড়ভাগ, উদ্ভিদভাগ, পশুভাগ, বর্বরভাগ, সত্যভাগ, দেবভাগ ইত্যাদি। এই ভিন্ন ভিন্ন ভাগের এক-একটা বিশেষ জন্মঋতু আছে। কোন্ ঋতুতে কোন্ ভাগ পড়ে তাহা নির্ণয় করিবার ভার আমি লইব না। একটা সিদ্ধান্তকে শেষ পর্যন্ত মিলাইয়া দিব পণ করিলে বিস্তর মিথ্যা বলিতে হয়। বলিতে রাজি আছি; কিন্তু এত পরিশ্রম আজ পারিব না।

আজ, পড়িয়া পড়িয়া, সম্মুখে চাহিয়া চাহিয়া যেটুকু সহজে মনে আসিতেছে সেইটুকুই লিখিতে বসিয়াছি।

দীর্ঘ শীতের পর আজ মধ্যাহ্নে প্রান্তরের মধ্যে নববসন্ত নিশ্বসিত হইয়া উঠিতেই নিজের মধ্য মনুষ্যজীবনের ভারি একটা অসামঞ্জস্য অনুভব করিতেছি। বিপুলের সহিত, সমগ্রের সহিত তাহার সুর মিলিতেছে না। শীতকালে আমার উপরে পৃথিবীর যে-সমস্ত তাগিদ ছিল আজও ঠিক সেই-সব তাগিদই চলিতেছে । ঋতু বিচিত্র, কিন্তু কাজ সেই একই। মনটাকে ঋতুপরিবর্তনের উপরে জয়ী করিয়া তাহাকে অসাড় করিয়া যেন মস্ত একটা কী বাহাদুরী আছে। মন মস্ত লোক, সে কী না পারে। সে দক্ষিনে হাওয়াকেও সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করিয়া হন্‌হন্ করিয়া বড়োবাজারে ছুটিয়া চলিয়া যাইতে পারে। পারে স্বীকার করিলাম, কিন্তু তাই বলিয়াই কি সেটা তাহাকে করিতেই হইবে? তাহাতে দক্ষিনে বাতাস বাসায় গিয়া মরিয়া থাকিবে না, কিন্তু ক্ষতিটা কাহার হইবে?

এই তো অল্পদিন হইল, আমাদের আমলকী মউল ও শালের ডাল হইতে খস্ খস্ করিয়া কেবলই পাতা খসিয়া পড়িতেছিল–ফাল্গুন দূরাগত পথিকের মতো যেমনি দ্বারের কাছে আসিয়া একটা হাঁপ ছাড়িয়া বসিয়াছে মাত্র, অমনি আমাদের বনশ্রেণী পাতা-খসানোর কাজ বন্ধ করিয়া দিয়া একেবারে রাতারাতিই কিসলয় গজাইতে শুরু করিয়া দিয়াছে।

আমরা মানুষ, আমাদের সেটি হইবার জো নাই। বাহিরে চারি দিকেই যখন হাওয়া-বদল, পাতা-বদল, রঙ-বদল, আমরা তখনো গোরুর গাড়ির বাহনটার মতো পশ্চাতে পুরাতনের ভারাক্রান্ত জের সমানভাবে টানিয়া লইয়া একটানা রাস্তায় ধূলা উড়াইয়া চলিয়াছি। বাহক তখনো যে লড়ি লইয়া পাঁজরে ঠেলিতেছিল এখনো সেই লড়ি।

হাতের কাছে পঞ্জিকা নাই, অনুমানে বোধ হইতেছে আজ ফাল্গুনের প্রায় পনেরোই কি ষোলোই হইবে-বসন্তলক্ষ্মী আজ ষোড়শী কিশোরী। কিন্তু তবু আজও হপ্তায় হপ্তায় খবরের কাগজ বাহির হইতেছে; পড়িয়া দেখি, আমাদের কর্তৃপক্ষ আমাদের হিতের জন্য আইন তৈরি করিতে সমানই ব্যস্ত এবং অপর পক্ষ তাহারই তন্ন তন্ন বিচারে প্রবৃত্ত। বিশ্বজগতে এইগুলাই যে সর্বোচ্চ ব্যাপারনয়-বড়োলাট ছোটোলাট সম্পাদক ও সহকারী সম্পাদকের উৎকট ব্যস্ততাকে কিছুমাত্র গণ্য না করিয়া দক্ষিণসমুদ্রের তরঙ্গোৎসবসভা হইতে প্রতিবৎসরের সেই চিরন্তন বার্তাবহ নবজীবনের আনন্দসমাচার লইয়া ধরাতলে অক্ষয় প্রাণের আশ্বাস নূতন করিয়া প্রচার করিতে বাহির হয়, এটা মানুষের পক্ষে কম কথা নয়, কিন্তু এ-সব কথা ভাবিবার জন্য আমাদের ছুটি নাই।

সেকালে আমাদের মেঘ ডাকিলে অনধ্যায় ছিল, বর্ষার সময় প্রবাসীরা বাড়ি ফিরিয়া আসিতেন। বাদলার দিনে যে পড়া যায় না বা বর্ষার সময় বিদেশে কাজ করা অসম্ভব এ কথা বলিতে পারি না-মানুষ স্বাধীন স্বতন্ত্র, মানুষ জড়প্রকৃতির আঁচল-ধরা নয়। কিন্তু জোর আছে বলিয়াই বিপুল প্রকৃতির সঙ্গ ক্রমাগত বিদ্রোহ করিয়াই চলিতে হইবে, এমন কী কথা আছে। বিশ্বের সহিত মানুষ নিজের কুটুম্বিতা স্বীকার করিলে, আকাশে নবনীলাঞ্জন মেঘোদয়ের খাতিরে পড়া বন্ধ ও কাজ বন্ধ করিলে, দক্ষিনে হাওয়ার প্রতি একটুখানি শ্রদ্ধা রক্ষা করিয়া আইনের সমালোচনা বন্ধ রাখিলে, মানুষ জগৎচরাচরের মধ্যে একটা বেসুরের মতো বাজিতে থাকে না। পাঁজিতে তিথিবিশেষে বেগুন শিম কুষ্মাণ্ড নিষিদ্ধ আছে; আরো কতকগুলি নিষেধ থাকা দরকার-কোন্ ঋতুতে খবরের কাগজ পড়া অবৈধ, কোন্ ঋতুতে আপিস

কামাই না করা মহাপাতক, অরসিকের নিজবুদ্ধির উপর তাহা নির্ণয় করিবার ভার না দিয়া শাস্ত্রকারদের তাহা একেবারে বাঁধিয়া দেওয়া উচিত।

বসন্তের দিনে যে বিরহিনীর প্রাণ হা হা করে এ কথা আমরা প্রাচীন কাব্যেই পড়িয়াছি; এখন এ কথা লিখিতে আমাদের সংকোচ বোধ হয়, পাছে লোকে হাসে। প্রকৃতির সঙ্গ আমাদের মনের সম্পর্ক আমরা এমনি করিয়াই ছেদন করিয়াছি। বসন্তে সমস্ত বনে-উপবনে ফুল ফুটিবার সময় উপস্থিত হয়; তখন তাহাদের প্রাণের অজস্রতা, বিকাশের উৎসব। তখন আত্মদানের উচ্ছ্বাসে তরুলতা পাগল হইয়া উঠে; তখন তাহাদের হিসাবের বোধমাত্র থাকে না-যেখানে দুটো ফল ধরিবে সেখানে পঁচিশটা মুকুল ধরাইয়া বসে। মানুষই কি কেবল এই অজস্রতার স্রোত রোধ করিবে? সে আপনাকে ফুটাইবে না, ফলাইবে না, দান করিতে চাহিবে না, কেবলই কি ঘর নিকাইবে, বাসন মাজিবে ও যাহাদের সে বালাই নাই তাহারা বেলা চারটে পর্যন্ত পশমের গলাবন্ধ বুনিবে? আমরা কি এতই একান্ত মানুষ? আমরা কি বসন্তের নিগূঢ়-রসসঞ্চার-বিকশিত তরুলতা-পুষ্পপল্লবের কেহই নই? তাহারা যে আমাদের ঘরের আঙিনাকে ছায়ায় ঢাকিয়া, গন্ধে ভরিয়া, বাহু দিয়া ঘেরিয়া দাঁড়াইয়া আছে, তাহারা কি আমাদের এতই পর যে তাহারা যখন ফুলে ফুটিয়া উঠিবে আমরা তখন চাপকান পরিয়া আপিসে যাইব-কোনো অনির্বচনীয় বেদনায় আমাদের হৃৎপিন্ড তরুপল্লবের মতো কাঁপিয়া উঠিবে না?

আমি তো আজ গাছপালার সঙ্গ বহু প্রাচীন কালের আত্মীয়তা স্বীকার করিব। ব্যস্ত হইয়া কাজ করিয়া বেড়ানোই যে জীবনের অদ্বিতীয় সার্থকতা এ কথা আজ আমি কিছুতেই মানিব না। আজ আমাদের সেই যুগান্তরের বড়োদিদি বনলক্ষ্মীর ঘরে ভাইফোঁটার নিমন্ত্রণ। সেখানে আজ তরুলতার সঙ্গ নিতান্ত ঘরের লোকের মতো মিশিতে হইবে-আজ ছায়ায় পড়িয়া সমস্ত দিন কাটিবে, মাটিকে আজ দুই হাত ছড়াইয়া আঁকড়াইয়া ধরিতে হইবে, বসন্তের হাওয়া যখন বহিবে তখন তাহার আনন্দকে যেন আমার বুকের পাঁজরগুলার মধ্য দিয়া অনায়াসে হু হু করিয়া বহিয়া যাইতে দিই-সেখানে সে যেন এমনতরো কোনো ধ্বনি না জাগাইয়া তোলে গাছপালারা যে ভাষা না বোঝে। এমনি করিয়া চৈত্রের শেষ পর্যন্ত মাটি বাতাস ও

আকাশের মধ্যে জীবনটাকে কাঁচা করিয়া, সবুজ করিয়া, ছড়াইয়া দিব-আলোতে ছায়াতে চুপ করিয়া পড়িয়া থাকিব।

কিন্তু, হায়, কোনো কাজই বন্ধ হয় নাই; হিসাবের খাতা সমানই খোলা রহিয়াছে। নিয়মের কলের মধ্যে, কর্মের ফাঁদের মধ্যে পড়িয়া গেছি, এখন বসন্ত আসিলেই কী আর গেলেই কী।

মনুষ্যসমাজের কাছে আমার সবিনয় নিবেদন এই যে, এ অবস্থাটা ঠিক নহে, ইহার সংশোধন দরকার। বিশ্বের সহিত স্বতন্ত্র বলিয়াই যে মানুষের গৌরব তাহা নহে। মানুষের মধ্যে বিশ্বের সকল বৈচিত্র্যই আছে বলিয়া মানুষ বড়ো। মানুষ জড়ের সহিত জড়, তরুলতার সঙ্গ তরুলতা, মৃগপক্ষীর সঙ্গ মৃগপক্ষী। প্রকৃতি-রাজবাড়ির নানা মহলের নানা দরজাই তাহার কাছে খোলা। কিন্তু খোলা থাকিলে কী হইবে! এক-এক ঋতুতে এক-এক মহল হইতে যখন উৎসবের নিমন্ত্রণ আসে তখন মানুষ যদি গ্রাহ্য না করিয়া আপন আড়তের গদিতেই পড়িয়া থাকে, তবে এমন বৃহৎ অধিকার সে কেন পাইল? পূরা মানুষ হইতে হইলে তাহাকে সবই হইতে হইবে, এ কথা না মনে করিয়া মানুষ মনুষ্যত্বকে বিশ্ববিদ্রোহের একটা সংকীর্ণ ধ্বজাস্বরূপ খাড়া করিয়া তুলিয়া রাখিয়াছে কেন? কেন সে দম্ভ করিয়া বার বার এ কথা বলিতেছে-আমি জড় নহি, উদ্ভিদ নহি, পশু নহি, আমি মানুষ; আমি কেবল কাজ করি ও সমালোচনা করি, শাসন করি ও বিদ্রোহ করি। কেন সে এ কথা বলে না-আমি সমস্তই, সকলের সঙ্গই আমার অবারিত যোগ আছে, সাতন্ত্র্যের ধ্বজা আমার নহে।

হায় রে সমাজ-দাঁড়ের পাখি, আকাশের নীল আজ বিরহিণীর চোখদুটির মতো স্বপ্নাবিষ্ট, পাতার সবুজ আজ তরুণীর কপোলের মতো নবীন, বসন্তের বাতাস আজ মিলনের আগ্রহের মতো চঞ্চল। তবু, তোর পাখা-দুটা আজ বন্ধ, তবু তোর পায়ে আজ কর্মের শিকল ঝন্ ঝন্ করিয়া বাজিতেছে-এই কি মানবজন্ম!

চৈত্র, ১৩০৯

রুদ্ধ গৃহ

বৃহৎ বাড়ির মধ্যে কেবল একটি ঘর বন্ধ। তাহার তালাতে মরিচা ধরিয়াছে,তাহার চাবি কোথাও খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। সন্ধ্যাবেলা সে ঘরে আলো জ্বলে না, দিনের বেলা সে ঘরে লোক থাকে না–এমন কতদিন হইতে কে জানে।

সে ঘর খুলিতে ভয় হয়, অন্ধকারে তাহার সমুখ দিয়া চলিতে গা ছম্‌ছম্‌ করে। যেখানে মানুষ হাসিয়া মানুষের সঙ্গ কথা কয় না, সেইখানেই আমাদের যত ভয়। যেখানে মানুষে মানুষে দেখাশুনা হয় সেই পবিত্র স্থানে ভয় আসিতে পারে না।

দুইখানি দরজা ঝাঁপিয়া ঘর মাঝখানে দাঁড়াইয়া আছে। দরজার উপর কান দিয়া থাকিলে ঘরের ভিতর যেন হু হু শব্দ শুনা যায়।

এ ঘর বিধবা। একজন কে ছিল সে গেছে, সেই হইতে এ গৃহের দ্বার রুদ্ধ। সেই অবধি এখানে আর কেহ আসেও না, এখান হইতে আর কেহ যায়ও না। সে অবধি এখানে যেন মৃত্যুরও মৃত্যু হইয়াছে।

এ জগতে অবিশ্রাম জীবনের প্রবাহ মৃত্যুকে হু হু করিয়া ভাসাইয়া লইয়া যায়, মৃত কোথাও টিঁকিয়া থাকিতে পারে না। এই ভয়ে সমাধিভবন কৃপণের মতো মৃতকে চোরের হাত হইতে রক্ষা করিবার জন্য পাষাণপ্রাচীরের মধ্যে লুকাইয়া রাখে, ভয় তাহার উপরে দিবারাত্র পাহারা দিতে থাকে। মৃত্যুকেই লোকে চোর বলিয়া নিন্দা করে, কিন্তু জীবনও যে চকিতের মধ্যে মৃত্যুকে চুরি করিয়া আপনার বহুবিস্তৃত পরিবারের মধ্যে বাঁটিয়া দেয়, সে কথার কেহ উল্লেখ করে না।

পৃথিবী মৃত্যুকেও কোলে করিয়া লয় জীবনকেও কোলে করিয়া রাখে, পৃথিবীর কোলে উভয়েই ভাইবোনের মতো খেলা করে। এই জীবনমৃত্যুর প্রবাহ দেখিলে, তরঙ্গভঙ্গর উপর ছায়া-আলোর খেলা দেখিলে, আমাদের কোনো ভয় থাকে না; কিন্তু বদ্ধ-মৃত্যু রুদ্ধ-ছায়া দেখিলেই আমাদের ভয় হয়। মৃত্যুর গতি যেখানে আছে,

সূচিপত্র

জীবনের হাত ধরিয়া মৃত্যু যেখানে একতালে নৃত্য করে, সেখানে মৃত্যুরও জীবন আছে, সেখানে মৃত্যু ভয়ানক নহে। কিন্তু চিহ্নের মধ্য আবদ্ধ গতিহীন মৃত্যুই প্রকৃত মৃত্যু, তাহাই ভয়ানক। এইজন্য সমাধিভূমি ভয়ের আবাসস্থল।

পৃথিবীতে যাহা আসে তাহাই যায়। এই প্রবাহেই জগতের স্বাস্থ্যরক্ষা হয়। কণামাত্রের যাতায়াত বন্ধ হইলে জগতের সামঞ্জস্য ভঙ্গ হয়। জীবন যেমন আসে জীবন তেমনি যায়। মৃত্যুও যেমন আসে মৃত্যুও তেমনি যায়। তাহাকে ধরিয়া রাখিবার চেষ্টা কর কেন? হৃদয়টাকে পাষাণ করিয়া সেই পাষাণের মধ্যে তাহাকে সমাহিত করিয়া রাখ কেন? তাহা কেবল অস্বাস্থ্যর কারণ হইয়া উঠে। ছাড়িয়া দাও, তাহাকে যাইতে দাও–জীবনমৃত্যুর প্রবাহ রোধ করিয়ো না। হৃদয়ের দুই দ্বারই সমান খুলিয়া রাখো। প্রবেশের দ্বার দিয়া সকলে প্রবেশ করুক, প্রস্থানের দ্বার দিয়া সকলে প্রস্থান করিবে।

গৃহ দুই দ্বারই রুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। যে দিন দ্বার প্রথম রুদ্ধ হইল সেইদিনকার পুরাতন অন্ধকার আজও গৃহের মধ্যে একলা জাগিয়া আছে। গৃহের বাহিরে দিনের পর দিন, রাত্রির পর রাত্রি আসিতেছে; গৃহের মধ্যে কেবল সেই একটি দিনই বসিয়া আছে। সময় সেখানে চারিটি ভিত্তির মধ্যেই রুদ্ধ। পুরাতন কোথাও থাকে না, এই ঘরের মধ্যে আছে।

এই গৃহের অন্তরে বাহিরে সম্পূর্ণ বিচ্ছেদ হইয়াছে। বাহিরের বার্তা অন্তরে পৌঁছায় না, অন্তরের নিশ্বাস বাহিরে আসিতে পায় না। জগতের প্রবাহ এই ঘরের দুই পাশ দিয়া বহিয়া যায়। এই গৃহ যেন বিশ্বের সহিত নাড়ির বন্ধন ছেদন করিয়াছে।

দ্বার রুদ্ধ করিয়া গৃহ পথের দিকে চাহিয়া আছে। যখন পূর্ণিমার চাঁদের আলো তাহার দ্বারের কাছে হত্যা দিয়া পড়িয়া থাকে, তখন তাহার দ্বার খুলিব-খুলিব করে কি না কে বলিতে পারে। পাশের ঘরে যখন উৎসবের আনন্দধ্বনি উঠে, তখন কি তাহার অন্ধকার ছুটিয়া যাইতে চায় না? এ ঘর কী ভাবে চাহে, কী ভাবে শোনে, আমরা কিছুই বুঝিতে পারি না।

ছেলেরা যে একদিন এ ঘরের মধ্যে খেলা করিত, সেই কোলাহলময় দিন এই গৃহের নিশীথিনীর মধ্যে পড়িয়া আজ কাঁদিতেছে। এই গৃহের মধ্যে যে-সকল স্নেহ-প্রেমের লীলা হইয়া গিয়াছে সেই স্নেহ-প্রেমের উপর সহসা কপাট পড়িয়া গেছে- এই নিস্তব্ধ গৃহের বাহিরে দাঁড়াইয়া আমি তাহাদের ক্রন্দন শুনিতেছি। স্নেহ-প্রেম বদ্ধ করিয়া রাখিবার জন্য হয় নাই। মানুষের কাছ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া লইয়া তাহাকে গোর দিয়া রাখিবার জন্য হয় নাই। তাহাকে জোর করিয়া বাঁধিয়া রাখিলে সংসারক্ষেত্রের জন্য সে কাঁদে।

তবে এই গৃহ রুদ্ধ রাখিয়ো না, দ্বার খুলিয়া দাও। সূর্যের আলো দেখিয়া, মানুষের সাড়া পাইয়া, চকিত হইয়া ভয় প্রস্থান করিবে। সুখ এবং দুঃখ, শোক এবং উৎসব, জন্ম এবং মৃত্যু পবিত্র সমীরণের মতো ইহার বাতায়নের মধ্যে দিয়া চিরদিন যাতায়াত করিতে থাকিবে। সমস্ত জগতের সহিত ইহার যোগ হইয়া যাইবে।

আশ্বিন-কার্তিক, ১২৯২

পথপ্রান্তে

আমি পথের ধারে বসিয়া লিখি, তাই কী লিখি ভাবিয়া পাই না।

ছায়াময় পথ। প্রান্তে আমার ক্ষুদ্র গৃহ। তাহার বাতায়ন উন্মুক্ত। ভোরের বেলায় সূর্যের প্রথম কিরণ অশোকশাখার কম্পমান ছায়ার সঙ্গ আমার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়ায়, আমাকে দেখে, আমার কোলের উপর পড়িয়া খেলা করে, আমার লেখার উপর আসিয়া পড়ে এবং যখন চলিয়া যায় তখন লেখার উপরে খানিকটা সোনালি রঙ রাখিয়া দিয়া যায়; আমার লেখার উপরে তাহার কনকচুম্বনের চিহ্ন থাকিয়া যায়। আমার লেখার চারি ধারে প্রভাত ফুটিয়া উঠে। মাঠের ফুল, মেঘের রঙ, ভোরের বাতাস এবং একটুখানি ঘুমের ঘোর আমার পাতার মধ্যে মিশাইয়া থাকে, অরুণের প্রেম আমার অক্ষরগুলির চারিদিকে লতাইয়া উঠে।

আমার সমুখ দিয়া কত লোক আসে, কত লোক যায়। প্রভাতের আলো তাহাদের আশীর্বাদ করিতেছে, স্নেহভরে বলিতেছে “তোমাদের যাত্রা শুভ হউক’-পাখিরা কল্যাণগান করিতেছে, পথের আশেপাশে ফুটো-ফুটো ফুলেরা আশার মতো ফুটিয়া উঠিতেছে। যাত্রা-আরম্ভের সময়ে সকলে বলিতেছে, “ভয় নাই, ভয় নাই।’ প্রভাতে সকল বিশ্বজগৎ শুভযাত্রার গান গাহিতেছে। অনন্ত নীলিমার উপর দিয়া সূর্যের জ্যোতির্ময় রথ ছুটিয়াছে। নিখিল চরাচর যেন এইমাত্র বিশ্বেশ্বরের জয়ধ্বনি করিয়া বাহির হইল। সহাস্য প্রভাত আকাশে বাহুবিস্তার করিয়া আছে, অনন্তের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া জগৎকে পথ দেখাইয়া দিতেছে। প্রভাত, জগতের আশা, আশ্বাস, প্রতিদিবসের নান্দী। প্রতিদিন সে পূর্বের কনকদ্বার উদ্‌ঘাটন করিয়া জগতে স্বর্গ হইতে মঙ্গলবার্তা আনিয়া দেয়, সমস্ত দিনের মতো অমৃত আহরণ করিয়া আনে, তাহার সঙ্গ সঙ্গ নন্দনের পারিজাত গন্ধ আসিয়া পৃথিবীর ফুলের গন্ধ জাগাইয়া তোলে। প্রভাত জগতের যাত্রা আরম্ভের আশীর্বাদ; সে আশীর্বাদ মিথ্যা নহে।

আমার লেখার উপরে ছায়া ফেলিয়া পৃথিবীর লোক পথ দিয়া চলিয়া যাইতেছে। তাহারা সঙ্গ কিছুই লইয়া যায় না। তাহারা সুখ-দুঃখ ভুলিতে ভুলিতে চলিয়া যায়। জীবন হইতে প্রতি নিমেষের ভার ফেলিতে ফেলিতে চলিয়া যায়। তাহাদের হাসিকান্না আমার লেখার উপরে পড়িয়া অঙ্কুরিত হইয়া উঠে। তাহাদের গান তাহারা ভুলিয়া যায়, তাহাদের প্রেম তাহারা রাখিয়া যায়।

আর-কিছুই থাকে না, কিন্তু প্রেম তাহাদের সঙ্গ সঙ্গ থাকে। তাহারা সমস্ত পথ কেবল ভালোবাসিতে-বাসিতে চলে। পথের যেখানেই তাহারা পা ফেলে সেইখানটুকুই তাহারা ভালোবাসে। সেইখানেই তাহারা চিহ্ন রাখিয়া যাইতে চায়– তাহাদের বিদায়ের অশ্রুজলে সে জায়গাটুকু উর্বরা হইয়া উঠে। তাহাদের পথের দুই পার্শ্বে নূতন নূতন ফুল নূতন নূতন তারা ফুটিয়া থাকে। নূতন নূতন পথিকদিগকে তাহারা ভলোবাসিতে-বাসিতে অগ্রসর হয়। প্রেমের টানে তাহারা চলিয়া যায়; প্রেমের অভাবে তাহাদের প্রতি পদক্ষেপের শ্রান্তি দূর হইয়া যায়। জননীর স্নেহের ন্যায় জগতের শোভা সমস্ত পথ তাহাদের সঙ্গ সঙ্গ চলিতে থাকে, হৃদয়ের অন্ধকার অন্তঃপুর হইতে তাহাদিগকে বাহিরে ডাকিয়া আনে, পশ্চাৎ হইতে সম্মুখের দিকে তাহাদিগকে আলিঙ্গন করিয়া লইয়া যায়।

প্রেম যদি কেহ বাঁধিয়া রাখিতে পারিত তবে পথিকদের যাত্রা বন্ধ হইত। প্রেমের যদি কোথাও সমাধি হইত, তবে পথিক সেই সমাধির উপরে জড় পাষাণের মতো চিহ্নের স্বরূপ পড়িয়া থাকিত। নৌকার গুণ যেমন নৌকাকে বাঁধিয়া লইয়া যায়, যথার্থ প্রেম তেমনি কাহাকেও বাঁধিয়া রাখিয়া দেয় না, কিন্তু বাঁধিয়া লইয়া যায়। প্রেমের বন্ধনের টানে আর-সমস্ত বন্ধন ছিঁড়িয়া যায়। বৃহৎ প্রেমের প্রভাবে ক্ষুদ্র প্রেমের সূত্রসকল টুটিয়া যায়। জগৎ তাই চলিতেছে, নহিলে আপনার ভারে আপনি অচল হইয়া পড়িত।

পথিকেরা যখন চলে আমি বাতায়ন হইতে তাহাদের হাসি দেখি, কান্না শুনি। যে প্রেম কাঁদায় সেই প্রেমই আবার চোখের জল মুছাইয়া দেয়, হাসির আলো ফুটাইয়া তোলে। হাসিতে, অশ্রুতে, আলোতে বৃষ্টিতে আমাদের চারি দিকে সৌন্দর্যের

উপবন প্রফুল্ল করিয়া রাখে। প্রেম কাহাকেও চিরদিন কাঁদিতে দেয় না। যে প্রেম একের বিরহে তোমাকে কাঁদায় সেই প্রেমই আর পাঁচকে তোমার কাছে আনিয়া দেয়; প্রেম বলে, “একবার ভালো করিয়া চাহিয়া দেখো, যে গেছে ইহারা তাহার অপেক্ষা কিছু মাত্র কম নহে।’ কিন্তু তুমি অশ্রুজলে অন্ধ, তুমি আর-কাহাকেও দেখিতে পাও না, তাই ভালোবাসিতে পার না। তুমি তখন মরিতে চাও, সংসারের কাজ করিতে পার না। তুমি পিছন ফিরিয়া বসিয়া থাক, জগতে যাত্রা করিতে চাও না। কিন্তু অবশেষে প্রেমের জয় হয়, প্রেম তোমাকে টানিয়া লইয়া যায়, তুমি মৃত্যুর উপরে মুখ গুঁজিয়া চিরদিন পড়িয়া থাকিতে পার না।

প্রভাতে যাহারা প্রফুল্লহৃদয়ে যাত্রা করিয়া বাহির হয় তাহাদিগকে অনেক দূরে যাইতে হইবে। অনেক অনেক দূর। পথের উপরে যদি তাহাদের ভালোবাসা না থাকিত তবে তাহারা এ দীর্ঘ পথ চলিতে পারিত না। পথ ভালোবাসে বলিয়াই প্রতি পদক্ষেপেই তাহাদের তৃপ্তি। এই পথ ভালোবাসে বলিয়াই তাহারা চলে, আবার এই পথ ভালোবাসে বলিয়াই তাহারা চলিতে চাহে না। তাহারা পা উঠাইতে চাহে না । প্রতি পদে তাহাদের ভ্রম হয় “যেমন পাইয়াছি এমন আর পাইব না’, কিন্তু অগ্রসর হইয়াই আবার সমস্ত ভুলিয়া যায়। প্রতি পদে তাহারা শোক মুছিয়া মুছিয়া চলে। তাহারা আগে-ভাগে আশঙ্কা করিয়া বসে বলিয়াই কাঁদে, নহিলে কাঁদিবার কোনো কারণ নাই।

ঐ দেখো, কচি ছেলেটিকে বুকে করিয়া মা সংসারের পথে চলিয়াছে। ঐ ছেলেটির উপরে মাকে কে বাঁধিয়াছে? ঐ ছেলেটিকে দিয়া মাকে কে টানিয়া লইয়া যাইতেছে? প্রেমের প্রভাবে পথর কাঁটা মায়ের পায়ের তলে কেমন ফুল হইয়া উঠিতেছে। ছেলেটিকে মায়ের কোলে দিয়া পথকে গৃহের মতো মধুর করিয়াছে কে? কিন্তু হায়, মা ভুল বোঝে কেন? মা কেন মনে করে এই ছেলেটির মধ্যেই তাহার অনন্তের অবসান? অনন্তের পথে যেখানে পৃথিবীর সকল ছেলে মিলিয়া খেলা করে, একটি ছেলে মায়ের হাত ধরিয়া মাকে সেই ছেলের রাজ্যে লইয়া যায়-সেখানে শতকোটি সন্তান। সেখানে বিশ্বের কচি মুখগুলি ফুটিয়া একেবারে নন্দনবন করিয়া রাখিয়াছে। আকাশের চাঁদকে কাড়াকাড়ি করিয়া লইবার জন্য কী

আগ্রহ। সেখানে স্খলিত মধুর ভাষার কল্লোল। আবার ও দিকে শোনো–সুকুমার অসহায়েরা কী কান্নাই কাঁদিতেছে। শিশুদেহে রোগ প্রবেশ করিয়া ফুলের পাপড়ির মতো কোমল তনুগুলি জীর্ণ করিয়া ফেলিতেছে। কোমল কণ্ঠ হইতে স্বর বাহির হইতেছে না; ক্ষীণস্বরে কাঁদিতে চেষ্টা করিতেছে, কান্না কণ্ঠের মধ্যেই মিলাইয়া যাইতেছে। আর, ঐ শিশুদের প্রতি বর্বর বয়স্কদের কত অত্যাচার!

একটি ছেলে আসিয়া মাকে পৃথিবীর সকল ছেলের মা করিয়া দেয়। যার ছেলে নাই তার কাছে অনন্ত স্বর্গের একটা দ্বার রুদ্ধ, ছেলেটি আসিয়া স্বর্গের সেই দ্বারটি খুলিয়া দেয়; তার পর তুমি চলিয়া যাও, সেও চলিয়া যাক। তার কাজ ফুরাইল, তার অন্য কাজ আছে।

প্রেম আমাদিগকে ভিতর হইতে বাহিরে লইয়া যায়, আপন হইতে অন্যের দিকে লইয়া যায়, এক হইতে আর-এক দিকে অগ্রসর করিয়া দেয়। এইজন্যই তাহাকে পথের আলো বলি; সে যদি আলেয়ার আলো হইত তবে সে পথ ভুলাইয়া ঘাড় ভাঙিয়া তোমাকে যা-হোক একটা-কিছুর মধ্যে ফেলিয়া দিত, আর-সমস্ত রুদ্ধ করিয়া দিত, সেই একটা-কিছুর মধ্যে পড়িয়াই তোমার অনন্তযাত্রার অবসান হইত–অন্য পথিকেরা তোমাকে মৃত বলিয়া চলিয়া যাইত। কিন্তু এখন সেটি হইবার জো নাই। একটিকে ভালোবাসিলেই আর-একটিকে ভালোবাসিতে শিখিবে; অর্থাৎ এককে অতিক্রম করিবার উদ্দেশেই একের দিকে ধাবমান হইতে হইবে।

পথ দেখাইবার জন্যই সকলে আসিয়াছে, পথের বাধা হইবার জন্য কেহ আসে নাই। এইজন্য কেহই ভিড় করিয়া তোমাকে ঘিরিয়া থাকে না, সকলেই সরিয়া গিয়া তোমাকে পথ করিয়া দেয়, সকলেই একে একে চলিয়া যায়। কেহই আপনাকে বা আর-কাহাকেও বদ্ধ করিয়া রাখিতে পারে না। ইচ্ছা করিয়া যে ব্যক্তি নিজের চারি দিকে দেয়াল গাঁথিয়া তোলে, কালের প্রবাহ ক্রমাগত আঘাত করিয়া তাহার সে দেয়াল একদিন ভাঙিয়া দেয়, তাহাকে পথের মধ্যে বাহির করিয়া দেয়। তখন সে আবরণের অভাবে হি-হি করিয়া কাঁপিতে থাকে, হায়-হায় করিয়া কাঁদিয়া মরে। জগৎকে দ্বিধা হইতে বলে। ধূলির মধ্যে আচ্ছন্ন হইবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করে।

সূচিপত্র

আমরা তো পথিক হইয়াই জন্মিয়াছি–অনন্ত শক্তিমান যদি এই অনন্ত পথের উপর দিয়া আমাদিগকে কেবলমাত্র বলপূর্বক লইয়া যাইতেন, প্রচণ্ড অদৃষ্ট যদি আমাদের চুলের মুঠি ধরিয়া হিড়্ হিড়্ করিয়া টানিয়া লইয়া যাইত, তবে আমরা দুর্বলেরা কী করিতে পারিতাম? কিন্তু যাত্রার আরম্ভে শাসনের বজ্রধ্বনি শুনিতেছি না, প্রভাতের আশ্বাসবাণী শুনিতেছি। পথের মধ্যে কষ্ট আছে, দুঃখ আছে বটে, কিন্তু তবু আমরা ভালোবাসিয়া চলিতেছি। সকল সময়ে আমরা গ্রাহ্য করি না বটে, কিন্তু ভালোবাসা সহস্র দিক হইতে তাহার বাহু বাড়াইয়া আছে। সেই অবিশ্রাম ভালোবাসার আহ্বানই আমরা যেন শিরোধার্য করিয়া চলিতে শিখি; মোহে জড়াইয়া না পড়ি, অবশেষে অমোঘ শাসন আসিয়া আমাদিগকে যেন শৃঙ্খলে বাঁধিয়া না লইয়া যায়।

আমি এই সহস্র লোকের বিলাপ এবং আনন্দধ্বনির ধারে বসিয়া আছি। আমি দেখিতেছি, ভাবিতেছি, ভালোবাসিতেছি। আমি পথিকদিগকে বলিতেছি, “তোমাদের যাত্রা শুভ হউক। আমি আমার প্রেম তোমাদিগকে পাথেয় স্বরূপে দিতেছি।’ কারণ, পথ চলিতে আর-কিছুর আবশ্যক নাই, কেবল প্রেমের আবশ্যক। সকলে যেন সকলকে সেই প্রেম দেয়। পথিক যেন পথিককে পথ চলিতে সাহায্য করে।

অগ্রহায়ণ, ১২৯২

ছোটোনাগপুর

রাত্রে হাবড়ায় রেলগাড়িতে চড়িলাম। গাড়ির ঝাঁকানিতে নাড়া পাইয়া ঘুমটা যেন ঘোলাইয়া যায়। চেতনায়, ঘুমে, স্বপ্নে জাগরণে খিচুড়ি পাকাইয়া যায়। মাঝে মাঝে আলোর শ্রেণী, ঘন্টাধ্বনি, কোলাহল, বিচিত্র আওয়াজে স্টেশনের নাম হাঁকা। আবার ঠং ঠং ঠং তিনটে ঘন্টার শব্দে মুহূর্তের মধ্যে সমস্ত অন্তর্হিত, সমস্ত অন্ধকার, সমস্ত নিস্তব্ধ , কেবল স্তিমিততারা নিশীথিনীর মধ্যে গাড়ির চাকার অবিশ্রাম শব্দ। সেই শব্দের তালে তালে মাথার ভিতরে সৃষ্টিছাড়া স্বপ্নের দল সমস্ত রাত্রি ধরিয়া নৃত্য করিতে থাকে। রাত চারটার সময় মধুপুর স্টেশনে গাড়ি বদল করিতে হইল। অন্ধকার মিলাইয়া আসিলে পর প্রভাতের আলোকে গাড়ির জানলায় বসিয়া বাহিরে চাহিয়া দেখিলাম।

গাড়ি অবিশ্রাম অগ্রসর হইতে লাগিল। ভাঙা মাঠের এক-এক জায়গায় শুষ্ক নদীর বালুকারেখা দেখা যায়; সেই নদীর পথে বড়ো বড়ো কালো কালো পাথর পৃথিবীর কঙ্কালের মতো বাহির হইয়া পড়িয়াছে। মাঝে মাঝে এক-একটা মুণ্ডের মতো পাহাড় দেখা যাইতেছে। দূরের পাহাড়গুলি ঘন নীল, যেন আকাশের নীল মেঘ খেলা করিতে আসিয়া পৃথিবীতে ধরা পড়িয়াছে; আকাশে উড়িবার জন্য যেন পাখা তুলিয়াছে, কিন্তু বাঁধা আছে বলিয়া উড়িতে পারিতেছে না; আকাশ হইতে তাহার স্বজাতীয় মেঘেরা আসিয়া তাহার সঙ্গে কোলাকুলি করিয়া যাইতেছে। ঐ দেখো, পাথরের মতো কালো ঝাঁকরা-চুলের ঝুঁটি বাঁধা মানুষ হাতে একগাছা লাঠি লইয়া দাঁড়াইয়া। দুটো মহিষের ঘাড়ে একটা লাঙল জোড়া, এখনো চাষ আরম্ভ হয় নাই, তাহারা স্থির হইয়া রেলগাড়ির দিকে তাকাইয়া আছে। মাঝে মাঝে এক-একটা জায়গা ঘৃতকুমারীর বেড়া দিয়া ঘেরা, পরিষ্কার তক্‌তক্‌ করিতেছে, মাঝখানে একটি বাঁধানো ইঁদারা। চারিদিক বড়ো শুষ্ক দেখাইতেছে। পাতলা লম্বা শুকনো সাদা ঘাসগুলো কেমন যেন পাকা চুলের মতো দেখাইতেছে। বেঁটে বেঁটে পত্রহীন গুল্মগুলি শুকাইয়া বাঁকিয়া কালো হইয়া গেছে। দূরে দূরে এক-একটা তালগাছ ছোট্টো মাথা ও একখানি দীর্ঘ পা লইয়া দাঁড়াইয়া আছে। মাঝে মাঝে এক-একটা

অশথগাছ আমগাছও দেখা যায়। শুষ্কক্ষেত্রের মধ্যে একটিমাত্র পুরাতন কুটিরের চাল-শূন্য ভাঙা ভিত্তি নিজের ছায়ার দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া আছে। কাছে একটা মস্ত গাছের দগ্ধ গুঁড়ির খানিকটা।

সকালে ছয়টার সময় গিরিধি স্টেশনে গিয়া পৌঁছিলাম। আর রেল গাড়ি নাই। এখান হইতে ডাক গাড়িতে যাইতে হইবে। ডাক গাড়ি মানুষে টানিয়া লইয়া যায়। একে কি আর গাড়ি বলে? চারটে চাকার উপর একটা ছোটো খাঁচা মাত্র।

সর্বপ্রথমে গিরিধি ডাকবাংলায় গিয়া স্নানাহার করিয়া লওয়া গেল। ডাক-বাংলার যত দূরে চাই, ঘাসের চিহ্ন নাই। মাঝে মাঝে গোটা কতক গাছ আছে। চারি দিকে যেন রাঙামাটির ঢেউ উঠিয়াছে। একটা রোগা টাটু ঘোড়া গাছের তলায় বাঁধা, চারিদিকে চাহিয়া কী যে খাইবে তাহা ভাবিয়া পাইতেছে না, কোনো কাজ না থাকাতে গাছের গুঁড়িতে গা ঘষিয়া গা চুলকাইতেছে। আর-একটা গাছে একটা ছাগল লম্বা দড়িতে বাঁধা, সে বিস্তর গবেষণায় শাকের মতো একটু একটু সবুজ উদ্ভিদ-পদার্থ পট্ পট্ করিয়া ছিঁড়িতেছে। এখান হইতে যাত্রা করা গেল। পাহাড়ে রাস্তা। সম্মুখে পশ্চাতে চাহিয়া দেখিলে অনেক দূর পর্যন্ত দেখা যায়। শুষ্ক শূন্য সুবিস্তৃত প্রান্তরের মধ্যে সাপের মতো আঁকিয়া-বাঁকিয়া ছায়াহীন সুদীর্ঘ পথ রৌদ্রে শুকাইয়া আছে। একবার কষ্টে সৃষ্টে টানিয়া ঠেলিয়া গাড়ি চড়াও রাস্তার উপর তুলিতেছে, একবার গাড়ি গড়্ গড়্ করিয়া দ্রুতবেগে ঢালু রাস্তায় নামিয়া যাইতেছে। ক্রমে চলিতে চলিতে আশেপাশে পাহাড় দেখা দিতে লাগিল। লম্বা লম্বা সরু সরু শালগাছ। উইয়ের ঢিবি। কাটা গাছের গুঁড়ি। স্থানে স্থানে এক-একটা পাহাড় আগাগোড়া কেবল দীর্ঘ সরু পত্রলেশশূন্য গাছে আচ্ছন্ন। উপবাসী গাছগুলো তাহাদের শুষ্ক শীর্ণ অস্থিময় দীর্ঘ আঙুল আকাশের দিকে তুলিয়া আছে; এই পাহাড়গুলাকে দেখিলে মনে হয় যেন ইহারা সহস্র তীরে বিদ্ধ হইয়াছে, যেন ভীষ্মের শরশয্যা হইয়াছে। আকাশে মেঘ করিয়া আসিয়া অল্প অল্প বৃষ্টি আরম্ভ হইয়াছে। কুলিরা গাড়ি টানিতে টানিতে মাঝে মাঝে বিকট চীৎকার করিয়া উঠিতেছে। মাঝে মাঝে পথের নুড়িতে হুঁচ্ট খাইয়া গাড়িটা অত্যন্ত চমকিয়া উঠিতেছে। মাঝের এক জায়গায় পথ অবসান হইয়া বিস্তৃত বালুকাশয্যায় একটি ক্ষীণ নদীর রেখা দেখা

দিল। নদীর নাম জিজ্ঞাসা করাতে কুলিরা কহিল “বড়াকর নদী’। টানাটানি করিয়া গাড়ি এই নদীর উপর দিয়া পার করিয়া আবার রাস্তায় তুলিল । রাস্তার দুই পাশে ডোবাতে জল দাঁড়াইয়াছে; তাহাতে চার-পাঁচটা মহিষ পরস্পরের গায়ে মাথা রাখিয়া অর্ধেক শরীর ডুবাইয়া আছে, পরম আলস্যভরে আমাদের দিকে এক-একবার কটাক্ষপাত করিতেছে মাত্র।

যখন সন্ধ্যা আসিল, আমরা গাড়ি হইতে নামিয়া হাঁটিয়া চলিলাম। অদূরে দুইটি পাহাড় দেখা যাইতেছে, তাহার মধ্য দিয়া উঠিয়া নামিয়া পথ গিয়াছে। যেখানেই চাহি চারি দিকে লোক নাই, লোকালয় নাই, শস্য নাই, চষা মাঠ নাই : চারি দিকে উঁচুনিচু পৃথিবী নিস্তব্ধ নিঃশব্দ কঠিন সমুদ্রের মতো ধূ ধূ করিতেছে । দিগ্‌দিগন্তরের উপরে গোধূলির চিক্‌চিকে সোনালি আঁধারের ছায়া আসিয়া পড়িয়াছে। কোথাও জনমানব জীবজন্তু নাই বটে, তবু মনে হয় এই সুবিস্তীর্ণ ভূমিশয্যায় যেন কোন্‌-এক বিরাট পুরুষের জন্য নিদ্রার আয়োজন হইতেছে। কে যেন প্রহরীর ন্যায় মুখে আঙুল দিয়া দাঁড়াইয়া, তাই সকলে ভয়ে নিশ্বাস রোধ করিয়া আছে। দূর হইতে উপছায়ার মতো একটি পথিক ঘোড়ার পিঠে বোঝা দিয়া আমাদের পাশ দিয়া ধীরে ধীরে চলিয়া গেল।

রাত্রিটা কোনোমতে জাগিয়া, ঘুমাইয়া, পাশ ফিরিয়া কাটিয়া গেল। জাগিয়া উঠিয়া দেখি বামে ঘনপত্রময় বন। গাছে গাছে লতা, ভূমি নানাবিধ গুল্মে আচ্ছন্ন। বনের মাথার উপর দিয়া দূর পাহাড়ের নীল শিখর দেখা যাইতেছে। মস্ত মস্ত পাথর। পাথরের ফাটলে এক-একটা গাছ; তাহাদের ক্ষুধিত শিকড়গুলো দীর্ঘ হইয়া চারিদিক হইতে বাহির হইয়া পড়িয়াছে, পাথরখানাকে বিদীর্ণ করিয়া তাহারা কঠিন মুঠি দিয়া খাদ্য আঁকড়িয়া ধরিতে চায়। সহসা বামে জঙ্গল কোথায় গেল। সুদূরবিস্তৃত মাঠ। দূরে গোরু চরিতেছে, তাহাদিগকে ছাগলের মতোছোট ছোট দেখাইতেছে। মহিষ কিম্বা গোরুর কাঁধে লাঙল দিয়া পশুর লাঙ্গুল মলিয়া চাষারা চাষ করিতেছে। চষা মাঠ বামে পাহাড়ের উপর সোপানে সোপানে থাকে থাকে উঠিয়াছে।

বেলা তিনটার সময় হাজারিবাগের ডাকবাংলায় আসিয়া পৌঁছিলাম। প্রশস্ত প্রান্তরের মধ্যে হাজারিবাগ শহরটি অতি পরিস্কার দেখা যাইতেছে। শাহরিক ভাব বড়ো নাই। গলিখুঁজি, আবর্জনা, নর্দমা, ঘেঁষাঘেঁষি, গোলমাল, গাড়িঘোড়া, ধুলোকাদা, মাছিমশা, এ-সকলের প্রাদুর্ভাব বড়ো নাই; মাঠ পাহাড় গাছপালার মধ্যে শহরটি তক্‌তক্ করিতেছে।

এক দিন কাটিয়া গেল। এখন দুপুর বেলা। ডাকবাংলার বারান্দার সম্মুখে কেদারায় একলা চুপ করিয়া বসিয়া আছি। আকাশ সুনীল। দুই খণ্ড শীর্ণ মেঘ সাদা পাল তুলিয়া চলিয়াছে। অল্প অল্প বাতাস আসিতেছে। একরকম মেঠো-মেঠো ঘেসো-ঘেসো গন্ধ পাওয়া যাইতেছে। বারান্দার চালের উপর একটা কাঠবিড়ালি। দুই শালিখ বারান্দায় আসিয়া চকিতভাবে পুচ্ছ নাচাইয়া লাফাইতেছে। পাশের রাস্তা দিয়া গোরু লইয়া যাইতেছে, তাহাদের গলার ঘন্টার ঠুং ঠুং শব্দ শুনিতেছি। লোকজনেরা কেউ ছাতা মাথায় দিয়া, কেউ কাঁধে মোট লইয়া, কেউ দু-একটা গোরু তাড়াইয়া, কেউ একটা ছোটো টাট্টুর উপর চড়িয়া, রাস্তা দিয়া অতি ধীরে-সুস্থে চলিতেছে; কোলাহল নাই, ব্যস্ততা নাই, মুখে ভাবনার চিহ্ন নাই। দেখিলে মনে হয় এখানকার মানবজীবন দ্রুত এঞ্জিনের মতো হাঁসফাঁস্ করিয়া অথবা গুরুভারাক্রান্ত গোরুর গাড়ির চাকার মতো আর্তনাদ করিতে করিতে চলিতেছে না। গাছের তলা দিয়া দিয়া একটুখানি শীতল নির্ঝর যেমন ছায়ায় ছায়ায় কুল্ কুল্ করিয়া যায়, জীবন তেমনি করিয়া যাইতেছে। সমুখে ঐ আদালত। কিন্তু এখানকার আদালতও তেমন কঠোরমূর্তি নয়। ভিতরে যখন উকিলে উকিলে শামলায় শামলায় লড়াই বাধিয়াছে তখন বাহিরের অশথ গাছ হইতে দুই পাপিয়ার অবিশ্রাম উত্তর-প্রত্যুত্তর চলিতেছে। বিচারপ্রার্থী লোকেরা আমগাছের ছায়ায় বসিয়া জটলা করিয়া হাহা করিয়া হাসিতেছে, এখান হইতে শুনিতে পাইতেছি। মাঝে মাঝে আদালত হইতে মধ্যাহ্নের ঘন্টা বাজিতেছে। চারিদিকে যখন জীবনের মৃদুমন্দ গতি তখন এই ঘন্টার শব্দ শুনিলে টের পাওয়া যায় যে শৈথিল্যের স্রোতে সময় ভাসিয়া যায় নাই, সময় মাঝখানে দাঁড়াইয়া প্রতি ঘন্টায় লৌহকণ্ঠে বলিতেছে, আর কেহ জাগুক না জাগুক আমি জাগিয়া আছি। কিন্তু লেখকের অবস্থা ঠিক সেরূপ নয়। আমার চোখে তন্দ্রা আসিতেছে।

আষাঢ়, ১২৯২

সরোজিনী-প্রয়াণ

অসমাপ্ত বিবরণ

১১ই জ্যৈষ্ঠ শুক্রবার। ইংরাজি ২৩শে মে ১৮৮৪ খৃস্টাব্দ। আজ শুভলগ্নে “সরোজিনী’ বাষ্পীয় পোত তাহার দুই সহচরী লৌহতরী দুই পার্শ্বে লইয়া বরিশালে তাহার কর্মস্থানের উদ্দেশ্যে যাত্রা করিবে। যাত্রীর দল বাড়িল; কথা ছিল আমরা তিনজনে যাইব– তিনটি বয়ঃপ্রাপ্ত পুরুষমানুষ। সকালে উঠিয়া জিনিসপত্র বাঁধিয়া প্রস্তুত হইয়া আছি, পরমপরিহসনীয়া শ্রীমতী ভ্রাতৃজায়া-ঠাকুরাণীর নিকটে ম্লানমুখে বিদায় লইবার জন্য সমস্ত উদ্‌যোগ করিতেছি, এমন সময় শুনা গেল তিনি সসন্তানে আমাদের অনুবর্তিনী হইবেন। তিনি কার মুখে শুনিয়াছেন যে, আমরা যে পথে যাইতেছি সে পথ দিয়া বরিশালে যাইব বলিয়া অনেকে বরিশালে যায় নাই এমন শুনা গিয়াছে; আমরাও পাছে সেইরূপ ফাঁকি দিই এই সংশয়ে তিনি অনেকক্ষণ ধরিয়া নিজের ডান হাতের পাঁচটা ছোটো ছোটো সরু সরু আঙুলের নখের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বিস্তর বিবেচনা করিতে লাগিলেন, অবশেষে ঠিক আটটার সময় নখাগ্র হইতে যতগুলো বিবেচনা ও যুক্তি সংগ্রহ সম্ভব সমস্ত নিঃশেষে আকর্ষণ করিয়া লইয়া আমাদের সঙ্গে গাড়িতে উঠিয়া বসিলেন।

সকালবেলায় কলিকাতার রাস্তা যে বিশেষ সুদৃশ্য তাহা নহে, বিশেষত চিৎপুর রোড। সকালবেলাকার প্রথম সূর্যকিরণ পড়িয়াছে শ্যাকরা গাড়ির আস্তাবলের মাথায় আর এক-সার বেলোয়ারি ঝাড়ওয়ালা মুসলমানদের দোকানের উপর। গ্যাস-ল্যাম্পগুলোর গায়ে সূর্যের আলো এমনি চিক্‌মিক্ করিতেছে, সে দিকে চাহিবার জো নাই। সমস্ত রাত্রি নক্ষত্রের অভিনয় করিয়া তাহাদের সাধ মেটে নাই, তাই সকালবেলায় লক্ষ যোজন দূর হইতে সূর্যকে মুখ ভেঙাইয়া অতিশয় চক্‌চকে মহত্বলাভের চেষ্টায় আছে। ট্রামগাড়ি শিস দিতে দিতে চলিয়াছে, কিন্তু এখনো যাত্রী বেশি জোটে নাই। ম্যুনিসিপ্যালিটির শকট কলিকাতার আবর্জনা বহন করিয়া, অত্যন্ত মন্থর হইয়া চলিয়া যাইতেছে। ফুটপাথের পার্শ্বে সারি সারি শ্যাকরা গাড়ি

আরোহীর অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া; সেই অবসরে অশ্বচর্মাবৃত চতুষ্পদ কঙ্কালগুলো ঘাড় হেঁট করিয়া অত্যন্ত শুকনো ঘাসের আঁটি অন্যমনস্কভাবে চিবাইতেছে; তাহাদের সেই পারমার্থিক ভাব দেখিলে মনে হয় যে, অনেক ভাবিয়া-চিন্তিয়া তাহারা তাহাদের সম্মুখস্থ ঘাসের আঁটির সঙ্গে সমস্ত জগৎসংসারের তুলনা করিয়া সারবত্তা ও সরসতা সম্বন্ধে কোনো প্রভেদ দেখিতে পায় নাই। দক্ষিণে মুসলমানের দোকানের হৃতচর্ম খাসির অঙ্গপ্রতঙ্গ কতক দড়িতে ঝুলিতেছে, কতক খণ্ড খণ্ড আকারে শলাকা আশ্রয় করিয়া অগ্নিশিখার উপরে ঘুর খাইতেছে এবং বৃহৎকায় রক্তবর্ণ কেশবিহীন শ্মশ্রুলগণ বড়ো বড়ো হাতে মস্ত মস্ত রুটি সেঁকিয়া তুলিতেছে। কাবাবের দোকানের পাশে ফুঁকো ফানুষ-নির্মাণের জায়গা, অনেক ভোর হইতেই তাহাদের চুলায় আগুন জ্বালানো হইয়াছে। ঝাঁপ খুলিয়া কেহ-বা হাত-মুখ ধুইতেছে, কেহ-বা দোকানের সম্মুখে ঝাঁট দিতেছে, দৈবাৎ কেহ-বা লাল-কলপ দেওয়া দাড়ি লইয়া চোখে চশমা আঁটিয়া একখানা পার্সি কেতাব পড়িতেছে। সম্মুখে মসজিদ; একজন অন্ধ ভিক্ষুক মসজিদের সিঁড়ির উপরে হাত পাতিয়া দাঁড়াইয়া আছে।

গঙ্গার ধারে কয়লাঘাটে গিয়া পৌঁছানো গেল। সম্মুখ হইতে ছাউনিওয়ালা বাঁধা নৌকাগুলো দৈত্যদের পায়ের মাপে বড়ো বড়ো চটিজুতার মতো দেখাইতেছে। মনে হইতেছে, তাহারা যেন হঠাৎ প্রাণ পাইয়া অনুপস্থিত চরণগুলি স্মরণ করিয়া চট্ চট্ করিয়া চলিবার প্রতীক্ষায় অধীর পড়িয়াছে। একবার চলিতে পাইলে হয়, এইরূপ তাহাদের ভাব। একবার উঠিতেছে, যেন উঁচু হইয়া ডাঙার দিকে চাহিয়া দেখিতেছে কেহ আসিতেছে কি না, আবার নামিয়া পড়িতেছে। একবার আগ্রহে অধীর হইয়া জলের দিকে চলিয়া যাইতেছে, আবার কী মনে করিয়া আত্মসম্বরণপূর্বক তীরের দিকে ফিরিয়া আসিতেছে। গাড়ি হইতে মাটিতে পা দিতে না দিতে ঝাঁকে ঝাঁকে মাঝি আমাদের উপরে আসিয়া পড়িল। এ বলে “আমার নৌকায়’, ও বলে “আমার নৌকায়’। এইরূপে মাঝির তরঙ্গে আমাদের তনুর তরী একবার দক্ষিণে, একবার বামে, একবার মাঝখানে আবর্তের মধ্যে ঘূর্ণিত হইতে লাগিল। অবশেষে অবস্থার তোড়ে, পূর্বজন্মের বিশেষ একটা কী কর্মফলে বিশেষ একটা নৌকার মধ্যে গিয়া পড়িলাম। পাল তুলিয়া নৌকা ছাড়িয়া দিল। গঙ্গায় আজ

কিছু বেশি ঢেউ দিয়াছে, বাতাসও উঠিয়াছে। এখন জোয়ার। ছোটো ছোটো নৌকাগুলি আজ পাল ফুলাইয়া ভারি তেজে চলিয়াছে। এখন জোয়ার। ছোটো ছোটো নৌকাগুলি আজ পাল ফুলাইয়া ভারি তেজে চলিয়াছে; আপনার দেমাকে আপনি কাত হইয়া পড়ে বা। একটা মস্ত স্টীমার দুই পাশে দুই লৌহতরী লইয়া আশপাশের ছোটোখাটো নৌকাগুলির প্রতি নিতান্ত অবজ্ঞাভরে লোহার নাকটা আকাশে তুলিয়া গাঁ গাঁ শব্দ করিতে করিতে সধূমনিশ্বাসে আমাদের দিকে ছুটিয়া আসিতেছে। মনোযোগ দিয়া দেখি আমাদেরই জাহাজ– “রাখ্ রাখ্! থাম্ থাম্! ‘ মাঝি কহিল, “মহাশয়, ভয় করিবেন না, এমন ঢের-বার জাহাজ ধরিয়াছি। বলা বাহুল্য এবারও ধরিল। জাহাজের উপর হইতে একটা সিঁড়ি নামাইয়া দিল। ছেলেদের প্রথমে উঠানো গেল, তাহার পর আমার ভাজ-ঠাকুরানী যখন বহুকষ্টে তাঁহার স্থলপদ্ম-পা-দুখানি জাহাজের উপর তুলিলেন তখন আমরাও মধুকরের মতো তাহারই পশ্চাতে উপরে উঠিয়া পড়িলাম।

২

যদিও স্রোত এবং বাতাস প্রতিকূলে ছিল, তথাপি আমাদের এই গজবর ঊর্ধ্বশুণ্ডে বৃংহিতধ্বনি করিতে করিতে গজেন্দ্রগমনের মনোহারিতা উপেক্ষা করিয়া চত্বারিংশৎ-তুরঙ্গ-বেগে ছুটিতে লাগিল। আমরা ছয়জন এবং জাহাজের বৃদ্ধ কর্তাবাবু এই সাতজনে মিলিয়া জাহাজের কামরার সম্মুখে খানিকটা খোলা জায়গায় কেদারা লইয়া বসিলাম। আমাদের মাথার উপরে কেবল একটি ছাত আছে। সম্মুখ হইতে হু হু করিয়া বাতাস আসিয়া কানের কাছে সোঁ সোঁ করিতে লাগিল, জামার মধ্যে প্রবেশ করিয়া তাহাকে অকস্মাৎ ফুলাইয়া তুলিয়া ফর্ ফর্ আওয়াজ করিতে থাকিল এবং আমার ভ্রাতৃজায়ার সুদীর্ঘ সুসংযত চুলগুলিকে বার বার অবাধ্যতাচরণে উৎসাহিত করিয়া তুলিল। তাহারা নাকি জাত-সাপিনীর বংশ, এই নিমিত্ত বিদ্রোহী হইয়া বেণী-বন্ধন এড়াইয়া পূজনীয়া ঠাকুরানীর নাসাবিবর ও মুখরন্ধ্রের মধ্যে পথ অনুসন্ধান করিতে লাগিল; আবার আর- কতকগুলি ঊর্ধ্বমুখ হইয়া আস্ফালন করিতে করিতে মাথার উপর রীতিমত নাগলোকের উৎসব বাধাইয়া দিল; কেবল বেণী-নামক অজগর সাপটা শত বন্ধনে বদ্ধ হইয়া, শত

সূচিপত্র

শেলে বিদ্ধ হইয়া, শত পাক পাকাইয়া নির্জীবভাবে খোঁপা আকারে ঘাড়ের কাছে কুণ্ডলী পাকাইয়া রহিল। অবশেষে কখন এক সময়ে দাদা কাঁধের দিকে মাথা নোয়াইয়া ঘুমাইতে লাগিলেন, বউঠাকুরাণীও চুলের দৌরাত্ম্য বিস্মৃত হইয়া চৌকির উপরে চক্ষু মুদিলেন।

জাহাজ অবিশ্রাম চলিতেছে। ঢেউগুলি চারিদিকে লাফাইয়া উঠিতেছে- তাহাদের মধ্যে এক-একটা সকলকে ছাড়াইয়া শুভ্র ফণা ধরিয়া হঠাৎ জাহাজের ডেকের উপর যেন ছোবল মারিতে আসিতেছে; গর্জন করিতেছে, পশ্চাতের সঙ্গীদের মাথা তুলিয়া ডাকিতেছে; স্পর্ধা করিয়া ফুলিয়া ফুলিয়া চলিতেছে – মাথার উপরে সূর্যকিরণ দীপ্তিমান চোখের মত জ্বলিতেছে – নৌকাগুলাকে কাত করিয়া ধরিয়া তাহার মধ্যে কী আছে দেখিবার জন্য উঁচু হইয়া দাঁড়াইয়া উঠিতেছে; মুহূর্তের মধ্যে কৌতূহল পরিতৃপ্ত করিয়া নৌকাটাকে ঝাঁকানি দিয়া আবার কোথায় তাহারা চলিয়া যাইতেছে। আপিসের ছিপ্‌ছিপে পান্‌সিগুলি পালটুকু ফুলাইয়া আপনার মধুর গতির আনন্দ আপনি যেন উপভোগ করিতে করিতে চলিতেছে; তাহারা মহৎ মাস্তুল-কিরীটী জাহাজের গাম্ভীর্য উপেক্ষা করে, স্টীমারের বিষাণধ্বনিও মান্য করে না, বরঞ্চ বড়ো বড়ো জাহাজের মুখের উপর পাল দুলাইয়া হাসিয়া রঙ্গ করিয়া চলিয়া যায়; জাহাজও তাহাতে বড়ো অপমান জ্ঞান করে না। কিন্তু গাধাবোটের ব্যবহার স্বতন্ত্র, তাহাদের নড়িতে তিন ঘন্টা, তাহাদের চেহারাটা নিতান্ত স্থূলবুদ্ধির মতো, তাহারা নিজে নড়িতে অসমর্থ হইয়া অবশেষে জাহাজকে সরিতে বলে – তাহারা গায়ের কাছে আসিয়া পড়িলে সেই স্পর্ধা অসহ্য বোধ হয়।

এক সময় শুনা গেল আমাদের জাহাজের কাপ্তেন নাই। জাহাজ ছাড়িবার পূর্বরাত্রেই সে গা-ঢাকা দিয়াছে শুনিয়া আমার ভাজ-ঠাকুরানীর ঘুমের ঘোর একেবারে ছাড়িয়া গেল; তাঁহার সহসা মনে হইল যে, কাপ্তেন যখন নাই তখন নোঙরের অচল-শরণ অবলম্বন করাই শ্রেয়। দাদা বলিলেন, তাহার আবশ্যক নাই, কাপ্তেনের নিচেকার লোকেরা কাপ্তেনের চেয়ে কোনো অংশে ন্যূন নহে। কর্তাবাবুরও সেইরূপ মত। বাকি সকলে চুপ করিয়া রহিল, কিন্তু তাহাদের মনের ভিতরটা আর কিছুতেই প্রসন্ন হইল না। তবে, দেখিলাম নাকি জাহাজটা সত্য সত্যই চলিতেছে, আর হাঁকডাকেও

কাপ্তেনের অভাব সম্পূর্ণ ঢাকা পড়িয়াছে, তাই চুপ মারিয়া রহিলাম। হঠাৎ জাহাজের হৃদয়ের ধুক্ ধুক্ শব্দ বন্ধ হইয়া গেল! কল চলিতেছে না! “নোঙর ফেলো’ “নোঙর ফেলো’ বলিয়া শব্দ উঠিল– নোঙর ফেলা হইল। কলের এক জায়গায় কোথায় একটা জোড় খুলিয়া গেছে, সেটা মেরামত করিলে তবে জাহাজ চলিবে। মেরামত আরম্ভ হইল। এখন বেলা সাড়ে দশটা, দেড়টার পূর্বে মেরামত সম্পূর্ণ হইবার সম্ভাবনা নাই।

বসিয়া বসিয়া গঙ্গাতীরের শোভা দেখিতে লাগিলাম। শান্তিপুরের দক্ষিণ হইতে আরম্ভ করিয়া গঙ্গাতীরের যেমন শোভা এমন আর কোথায় আছে। গাছপালা ছায়া কুটির– নয়নের আনন্দ অবিরল সারি সারি দুই ধারে বরাবর চলিয়াছে, কোথাও বিরাম নাই। কোথাও বা তটভূমি সবুজ ঘাসে আচ্ছন্ন হইয়া গঙ্গার কোলে আসিয়া গড়াইয়া পড়িয়াছে; কোথাও বা একেবারে নদীর জল পর্যন্ত ঘন গাছপালা লতাজালে জড়িত হইয়া ঝুঁকিয়া আসিয়াছে, জলের উপর তাহাদের ছায়া অবিশ্রাম দুলিতেছে; কতকগুলি সূর্যকিরণ সেই ছায়ার মাঝে মাঝে ঝিক্‌মিক্ করিতেছে, আর বাকি কতকগুলি– গাছপালার কম্পমান কচি মসৃণ সবুজ পাতার উপরে চিক্‌চিক্ করিয়া উঠিতেছে। একটা বা নৌকা তাহার কাছাকাছি গাছের গুঁড়ির সঙ্গে বাঁধা রহিয়াছে, সে সেই ছায়ার নীচে অবিশ্রাম জলের কুলকুল শব্দে মৃদু মৃদু দোল খাইয়া বড়ো আরামের ঘুম ঘুমাইতেছে। তাহার আর এক পাশে বড়ো বড়ো গাছের অতি ঘনচ্ছায়ার মধ্য দিয়া ভাঙা ভাঙা বাঁকা একটা পদচিহ্নের পথ জল পর্যন্ত নামিয়া আসিয়াছে। সেই পথ দিয়া গ্রামের মেয়েরা কলসী কাঁখে করিয়া জল লইতে নামিতেছে, ছেলেরা কাদার উপরে পড়িয়া জল ছোঁড়াছুঁড়ি করিয়া সাঁতার কাটিয়া ভারি মাতামাতি করিতেছে। প্রাচীন ভাঙা ঘাটগুলির কী শোভা! মানুষেরা যে এ ঘাট বাঁধিয়াছে তাহা একরকম ভুলিয়া যাইতে হয়; এও যেন গাছপালার মতো গঙ্গাতীরের নিজস্ব। ইহার বড়ো বড়ো ফাটলের মধ্য দিয়া অশথগাছ উঠিয়াছে, ধাপগুলির ইঁটের ফাঁক দিয়া ঘাস গজাইতেছে– বহু বৎসরের বর্ষার জলধারায় গায়ের উপরে শেয়ালা পড়িয়াছে– এবং তাহার রঙ চারি দিকের শ্যামল গাছপালার রঙের সহিত কেমন সহজে মিশিয়া গেছে। মানুষের কাজ ফুরাইলে প্রকৃতি নিজের হাতে সেটা সংশোধন করিয়া দিয়াছেন; তুলি ধরিয়া এখানে ওখানে নিজের রঙ

লাগাইয়া দিয়াছেন। অত্যন্ত কঠিন সগর্ব ধব্‌ধবে পারিপাট্য নষ্ট করিয়া, ভাঙাচোরা বিশৃঙ্খল মাধুর্য স্থাপন করিয়াছেন। গ্রামের যে-সকল ছেলেমেয়েরা নাহিতে বা জল লইতে আসে তাহাদের সকলেরই সঙ্গে ইহার যেন একটা-কিছু সম্পর্ক পাতানো আছে- কেহ ইহার নাতনি, কেহ ইহার ভাগ্‌নে, কেহ ইহার মা-মাসি। তাহাদের দাদামহাশয় ও দিদিমারা যখন এতটুকু ছিল তখন ইহারই ধাপে বসিয়া খেলা করিয়াছে, বর্ষার দিনে পিছল খাইয়া পড়িয়া গিয়াছে। আর সেই-যে যাত্রাওয়ালা বিখ্যাত গায়ক অন্ধ শ্রীনিবাস সন্ধ্যাবেলায় ইহার পইঠার উপর বসিয়া বেহালা বাজাইয়া গৌরী রাগিণীতে “গেল গেল দিন’ গাহিত ও গাঁয়ের দুই-চারিজন লোক আশেপাশে জমা হইত, তাহার কথা আর কাহারো মনে নাই। গঙ্গাতীরের ভগ্ন দেবালয়গুলিরও যেন বিশেষ কী মাহাত্ম আছে। তাহার মধ্যে আর দেবপ্রতিমা নাই। কিন্তু সে নিজেই জটাজূটবিলম্বিত অতি পুরাতন ঋষির মতো অতিশয় ভক্তিভাজন ও পবিত্র হইয়া উঠিয়াছে। এক-এক জায়গায় লোকালয় – সেখানে জেলেদের নৌকা সারি সারি বাঁধা রহিয়াছে। কতকগুলি জলে, কতকগুলি ডাঙায় তোলা, কতকগুলি তীরে উপুড় করিয়া মেরামত করা হইতেছে; তাহাদের পাঁজরা দেখা যাইতেছে। কুঁড়েঘরগুলি কিছু ঘন ঘন কাছাকাছি – কোনো-কোনোটা বাঁকাচোরা বেড়া দেওয়া – দুই-চারিটি গোরু চরিতেছে, গ্রামের দুই-একটা শীর্ণ কুকুর নিষ্কর্মার মতো গঙ্গার ধারে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে; একটা উলঙ্গ ছেলে মুখের মধ্যে আঙুল পুরিয়া বেগুনের খেতের সম্মুখে দাঁড়াইয়া অবাক হইয়া আমাদের জাহাজের দিকে চাহিয়া আছে। হাঁড়ি ভাসাইয়া লাঠি-বাঁধা ছোটো ছোটো জাল লইয়া জেলের ছেলেরা ধারে ধারে চিংড়ি মাছ ধরিয়া বেড়াইতেছে। সমুখে তীরে বটগাছের জালবদ্ধ শিকড়ের নীচে হইতে নদীস্রোতে মাটি ক্ষয় করিয়া লইয়া গিয়াছে ও সেই শিকড়গুলির মধ্যে একটি নিভৃত আশ্রয় নির্মিত হইয়াছে। একটি বুড়ি তাহার দুই-চারিটি হাঁড়িকুড়ি ও একটি চট লইয়া তাহারই মধ্যে বাস করে। আবার আর-এক দিকে চড়ার উপরে বহুদূর ধরিয়া কাশবন; শরৎকালে যখন ফুল ফুটিয়া উঠে তখন বায়ুর প্রত্যেক হিল্লোলে হাসির সমুদ্রে তরঙ্গ উঠিতে থাকে, যে কারণেই হউক, গঙ্গার ধারের ইঁটের পাঁজাগুলিও আমার দেখিতে বেশ ভালো লাগে; তাহাদের আশেপাশে গাছপালা থাকে না, চারি দিকে পোড়ো জায়গা এবড়ো-খেবড়ো, ইতস্তত কতকগুলা ইঁট খসিয়া পড়িয়াছে, অনেকগুলি ঝামা ছড়ানো, স্থানে স্থানে

মাটি কাটা – এই অনুর্বরতা-বন্ধুরতার মধ্যে পাঁজাগুলো কেমন হতভাগ্যের মতো দাঁড়াইয়া থাকে। গাছের শ্রেণীর মধ্য হইতে শিবের দ্বাদশ মন্দির দেখা যাইতেছে; সমুখে ঘাট, নহবতখানা হইতে নহবত বাজিতেছে। তাহার ঠিক পাশেই খেয়াঘাট। কাঁচা ঘাট, ধাপে ধাপে তালগাছের গুঁড়ি দিয়া বাঁধানো। আর, দক্ষিণে কুমারদের বাড়ি, চাল হইতে কুমড়া ঝুলিতেছে। একটি প্রৌঢ়া কুটিরের দেয়ালে গোবর দিতেছে; প্রাঙ্গণ পরিষ্কার, তক্‌তক্‌ করিতেছে; কেবল এক প্রান্তে মাচার উপরে লাউ লতাইয়া উঠিয়াছে, আর-এক দিকে তুলসীতলা।

সূর্যাস্তের নিস্তরঙ্গ গঙ্গায় নৌকা ভাসাইয়া দিয়া গঙ্গার পশ্চিম-পারের শোভা যে দেখে নাই সে বাংলার সৌন্দর্য দেখে নাই বলিলেও হয়। এই পবিত্র শান্তিপূর্ণ অনুপম সৌন্দর্যচ্ছবির বর্ণনা সম্ভবে না। এই স্বর্ণচ্ছায়া ম্লান সন্ধ্যালোকে দীর্ঘ নারিকেলের গাছগুলি, মন্দিরের চূড়া, আকাশের পটে আঁকা নিস্তব্ধ গাছের মাথাগুলি, স্থির জলের উপরে লাবণ্যের মতো সন্ধ্যার আভা- সুমধুর বিরাম, নির্বাপিত কলরব, অগাধ শান্তি – সে-সমস্ত মিলিয়া নন্দনের একখানি মরীচিকার মতো, ছায়াপথের পরপারবর্তী সুদূর শান্তিনিকেতনের একখানি ছবির মতো, পশ্চিমদিগন্তের ধারটুকুতে আঁকা দেখা যায়। ক্রমে সন্ধ্যার আলো মিলাইয়া যায়, বনের মধ্যে এ দিকে ও দিকে এক-একটি করিয়া প্রদীপ জ্বলিয়া উঠে, সহসা দক্ষিণের দিক হইতে একটা বাতাস উঠিতে থাকে, পাতা ঝর্‌ঝর্‌ করিয়া কাঁপিয়া উঠে, অন্ধকারে বেগবতী নদী বহিয়া যায়, কূলের উপরে অবিশ্রাম তরঙ্গ-আঘাতে ছল্‌ছল্‌ করিয়া শব্দ হইতে থাকে- আর-কিছু ভালো দেখা যায় না, শোনা যায় না, কেবল ঝিঁঝি পোকার শব্দ উঠে, আর জোনাকিগুলি অন্ধকারে জ্বলিতে নিভিতে থাকে। আরো রাত্রি হয়। ক্রমে কৃষ্ণপক্ষের সপ্তমীর চাঁদ ঘোর অন্ধকার অশথ গাছের মাথার উপর দিয়া ধীরে ধীরে আকাশে উঠিতে থাকে। নিম্নে বনের শ্রেণীবদ্ধ অন্ধকার, আর উপরে ম্লান চন্দ্রের আভা। খানিকটা আলো-অন্ধকার ঢাকা গঙ্গার মাঝখানে একটা জায়গায় পড়িয়া তরঙ্গে তরঙ্গে ভাঙিয়া ভাঙিয়া যায়। ও পারের অস্পষ্ট বনরেখার উপর আর খানিকটা আলো পড়ে, সেইটুকু আলোতে ভালো করিয়া কিছুই দেখা যায় না; কেবল ও পারের সুদূরতা ও অস্ফূটতাকে মধুর

রহস্যময় করিয়া তোলে। এ পারে নিদ্রার রাজ্য আর ও পারে স্বপ্নের দেশ বলিয়া মনে হইতে থাকে।

এই যে-সব গঙ্গার ছবি আমার মনে উঠিতেছে এ কি সমস্তই এইবারকারে স্টীমার-যাত্রার ফল? তাহা নহে। এ-সব কতদিনকার কত ছবি, মনের মধ্যে আঁকা রহিয়াছে। ইহারা বড়ো সুখের ছবি, আজ ইহাদের চারি দিকে অশ্রুজলের স্ফটিক দিয়া বাঁধাইয়া রাখিয়াছি। এমনতরো শোভা আর এ জন্মে দেখিতে পাইব না।

মেরামত শেষ হইয়া গেছে; যাত্রীদের স্নানাহার হইয়াছে, বিস্তর কোলাহল করিয়া নোঙর তোলা হইতেছে। জাহাজ ছাড়া হইল। বামে মুচিখোলার নবাবের প্রকাণ্ড খাঁচা; ডান দিকে শিবপুর বটানিকাল গার্ডেন। যত দটিণে যাইতে লাগিলাম, গঙ্গা ততই চওড়া হইতে লাগিল। বেলা দুটো-তিনটের সময় ফলমূল সেবন করিয়া সন্ধ্যাবেলায় কোথায় গিয়া থামা যাইবে তাহারই আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া গেল। আমাদের দক্ষিণে বামে নিশান উড়াইয়া অনেক জাহাজ গেল আসিল – তাহাদের সগর্ব গতি দেখিয়া আমাদের উৎসাহ আরো বাড়িয়া উঠিল। বাতাস যদিও উল্‌টা বহিতেছে, কিন্তু স্রোত আমাদের অনুকূল। আমাদের উৎসাহের সঙ্গে সঙ্গে জাহাজের বেগও অনেক বাড়িয়া□ জাহাজ বেশ দুলিতে লাগিল। দূর হইতে দেখিতেছি এক-একটা মস্ত ঢেউ ঘাড় তুলিয়া আসিতেছে, আমরা সকলে আনন্দের সঙ্গে তাহার জন্য প্রতীক্ষা করিয়া আছি – তাহারা জাহাজের পাশে নিস্ফল রোষে ফেনাইয়া উঠিয়া, গর্জন করিয়া, জাহাজের লোহার পাঁজরায় সবলে মাথা ঠুকিতেছে – হতাশ্বাস হইয়া দুই পা পিছাইয়া পুনশ্চ আসিয়া আঘাত করিতেছে – আমরা সকলে মিলিয়া তাহাই দেখিতেছি। হঠাৎ দেখি কর্তাবাবু মুখ বিবর্ণ করিয়া কর্ণধারের কাছে ছুটিয়া যাইতেছেন। হঠাৎ রব উঠিল, “এই এই – রাখ্‌ রাখ্‌! থাম্‌ থাম্‌!’ গঙ্গার তরঙ্গ অপেক্ষা প্রচণ্ডতর বেগে আমাদের সকলেরই হৃদয় তোলপাড় করিতে লাগিল। চাহিয়া দেখি সম্মুখে আমাদের জাহাজের উপর সবেগে একটি লোহার বয়া ছুটিয়া আসিতেছে, অর্থাৎ আমরা বয়ার উপরে ছুটিয়া চলিতেছি। কিছুতেই সামলাইতে পারিতেছি না। সকলেই মন্ত্রমুগ্ধের মতো বয়াটার দিকে

চাহিয়া আছি। সে জিনিসটা মহিষের মতো ঢুঁ উদ্যত করিয়া আসিতেছে। অবশেষে ঘা মারিল।

৩

কোথায় সেই অবিশ্রাম জলকল্লোল, শত লক্ষ তরঙ্গের অহোরাত্র উৎসব, কোথায় সেই অবিরল বনশ্রেণী, আকাশের সেই অবারিত নীলিমা, ধরণীর নবযৌবনে পরিপূর্ণ হৃদয়োচ্ছ্বাসের ন্যায় সেই অনন্তের দিকে চির-উচ্ছ্বসিত বিচিত্র তরুতরঙ্গ, কোথায় সেই প্রকৃতির শ্যামল স্নেহের মধ্যে প্রচ্ছন্ন শিশু লোমালয়গুলি – ঊর্ধ্বে সেই চিরস্থির আকাশের নিম্নে সেই চিরচঞ্চলা স্রোতস্বিনী! চিরস্তব্ধের সহিত চিরকোলাহলময়ের, সর্বত্রসমানের সহিত চিরবিচিত্রের, নির্বিকারের সহিত চিরপরিবর্তনশীলের অবিচ্ছেদ প্রেমের মিলন কোথায়! এখানে সুরকিতে ইঁটেতে, ধূলিতে নাসারন্ধ্রে, গাড়িতে ঘোড়াতে হঠযোগ চলিতেছে। এখানে চারিদিকে দেয়ালের সহিত দেয়ালের, দরজার সহিত হুড়কার, কড়ির সহিত বরগার, চাপ্‌কানের সহিত বোতামের আঁটা-আঁটি মিলন।

পাঠকেরা বোধ করি বুঝিতে পারিয়াছেন, এতদিন সরেজমিনে লেখা চলিতেছিল – সরে-জমিনে না হউক সরে- জলে বটে – এখন আমরা ডাঙার ধন ডাঙায় ফিরিয়া আসিয়াছি। এখন সেখানকার কথা এখানে, পূর্বেকার কথা পরে লিখিতে হইতেছে, সুতরাং এখন যাহা লিখিব তাহার ভুলচুকের জন্য দায়ী হইতে পারিব না।

এখন মধ্যাহ্ন। আমার সমুখে একটা ডেক্স, পাপোশে একটা কালো মোটা কুকুর ঘুমাইতেছে, বারান্দায় শিকলি-বাঁধা একটা বাঁদর লেজের উকুন বাছিতেছে, তিনটে কাক আলিসার উপরে বসিয়া অকারণ চেঁচাইতেছে এবং এক-একবার খপ করিয়া বাঁদরের ভুক্তাবশিষ্ট ভাত এক চঞ্চু লইয়া ছাদের উপরে উঠিয়া বসিতেছে। ঘরের কোণে একটা প্রাচীন হারমোনিয়ম-বাদ্যের মধ্যে গোটাকতক ইঁদুর খট্ খট্ করিতেছে। কলিকাতা শহরের ইমারতের একটি শুষ্ক কঠিন কামরা, ইহারই মধ্যে

আমি গঙ্গার আবাহন করিতেছি- তপঃক্ষীণ জহ্নুমুনির শুষ্ক পাকস্থলীর অপেক্ষা এখানে ঢের বেশি স্থান আছে। আর, স্থানসংকীর্ণতা বলিয়া কোনো পদার্থ প্রকৃতির মধ্যে নাই। সে আমাদের মনে। দেখো – বীজের মধ্যে অরণ্য, একটি জীবের মধ্যে তাহার অনন্ত বংশপরম্পরা। আমি যে ঐ স্টীফেন সাহেবের এক বোতল ব্লু-ব্ল্যাক কালি কিনিয়া আনিয়াছি, উহারই প্রত্যেক ফোঁটার মধ্যে কত পাঠকের সুষুপ্তি মাদার-টিংচার আকারে বিরাজ করিতেছে। এই বালির বোতল দৈবক্রমে যদি সুযোগ্য হাতে পড়িত তবে ওটাকে দেখিলে ভাবিতাম, সৃষ্টির পূর্ববর্তী অন্ধকারের মধ্যে এই বিচিত্র আলোকময় অমর জগৎ যেমন প্রচ্ছন্ন ছিল তেমনি ঐ এক বোতল অন্ধকারের মধ্যে কত আলোকময় নূতন সৃষ্টি প্রচ্ছন্ন আছে। একটা বোতল দেখিয়াই এত কথা মনে উঠে, যেখানে স্টীফেন সাহেবের কালির কারখানা সেখানে দাঁড়াইয়া একবার ভাবিলে বোধ করি মাথা ঠিক রাখিতে পারি না। কত পুঁথি, কত চটি, কত যশ, কত কলঙ্ক, কত জ্ঞান, কত পাগলামি, কত ফাঁসির হুকুম, যুদ্ধের ঘোষণা, প্রেমের লিপি কালো কালো হইয়া স্রোত বাহিয়া বাহির হইতেছে। ঐ স্রোত যখন সমস্ত জগতের উপর দিয়া বহিয়া গিয়াছে- তখন- দূর হউক কালি যে ক্রমেই গড়াইতে চলিল,স্টীফেন সাহেবের সমস্ত কারখানাটাই দৈবাৎ যেন উল্টাইয়া পড়িয়াছে – এবার ব্লটিং কাগজের কথা মনে পড়িতেছে। স্রোত ফিরানো যাক। এসো, এবার গঙ্গার স্রোতে এসো।

সত্য ঘটনায় ও উপন্যাসে প্রভেদ আছে তাহার সাক্ষ্য দেখো, আমাদের জাহাজ বয়ায় ঠেকিল, তবু ডুবিল না – পরম বীরত্ব-সহকারে কাহাকেও উদ্ধার করিতে হইল না – প্রথম পরিচ্ছেদে জলে ডুবিয়া মরিয়া ষড়্‌বিংশ পরিচ্ছেদে কেহ ডাঙায় বাঁচিয়া উঠিল না। না ডুবিয়া সুখী হইয়াছি সন্দেহ নাই, কিন্তু লিখিয়া সুখ হইতেছে না। পাঠকেরা নিশ্চয়ই অত্যন্ত নিরাশ হইবেন; কিন্তু আমি যে ডুবি নাই সে আমার দোষ নয়, নিতান্তই অদৃষ্টের কারখানা। অতএব আমার প্রতি কেহ না রুষ্ট হন এই আমার প্রার্থনা।

মরিলাম না বটে, কিন্তু যমরাজের মহিষের কাছ হইতে একটা রীতিমত ঢুঁ খাইয়া ফিরিলাম। সুতরাং সেই ঝাঁকানির কথাটা স্মরণফলকে খদিত হইয়া রহিল।

খানিকক্ষণ অবাকভাবে পরস্পরের মুখ-চাওয়া-চাওয়ি করা গেল– সকলেরই মুখে এক ভাব, সকলেই বাক্যব্যয় করা নিতান্ত বাহুল্য জ্ঞান করিলেন। বউঠাকরুন বৃহৎ একটা চৌকির মধ্যে কেমন একরকম হইয়া বসিয়া রহিলেন। তাঁহার দুইটি ক্ষুদ্র আনুষঙ্গিক আমার দুই পার্শ্ব জড়াইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। দাদা কিয়ৎক্ষণ ঘন ঘন গোঁফে তা দিয়া কিছুই সিদ্ধান্ত করিতে পারিলেন না। কর্তাবাবু রুষ্ট হইয়া বলিলেন, সমস্তই মাঝির দোষ; মাঝি কহিল, তাহার অধীনে যে ব্যক্তি হাল ধরিয়াছিল তাহার দোষ; সে কহিল, হালের দোষ। হাল কিছু না বলিয়া অধোবদনে সটান জলে ডুবিয়া রহিল, গঙ্গা দ্বিধা হইয়া তাহার লজ্জা রক্ষা করিলেন।

এইখানেই নোঙর ফেলা হইল। যাত্রীদের উৎসাহ দেখিতে দেখিতে হ্রাস পাইয়া গেল; সকালবেলায় যেমনতরো মুখের ভাব, কল্পনার এঞ্জিন-গঞ্জন গতি ও আওয়াজের উৎকর্ষ দেখা গিয়াছিল, বিকালে ঠিক তেমনটি দেখা গেল না। আমাদের উৎসাহ নোঙরের সঙ্গে সঙ্গে সাত হাত জলের নীচে নামিয়া পড়িল। একমাত্র আনন্দের বিষয় এই ছিল যে, আমাদিগকে অতদূর নামিতে হয় নাই। কিন্তু সহসা তাহারই সম্ভাবনা সম্বন্ধে চৈতন্য জন্মিল। এ সম্বন্ধে আমরা যতই তলাইয়া ভাবিতে লাগিলাম ততই আমাদের তলাইবার নিদারুণ সম্ভাবনা মনে মনে উদয় হইতে লাগিল। এইসময় দিনমণি অস্তাচলচুড়াবলম্বী হইলেন। বরিশালে যাইবার পথ অপেক্ষা বরিশালে না-যাইবার পথ অত্যন্ত সহজ ও সংক্ষিপ্ত, এ বিষয়ে চিন্তা করিতে করিতে দাদা জাহাজের ছাতের উপর পায়চারি করিতে লাগিলেন। একটা মোটা কাছির কুণ্ডলীর উপর বসিয়া এই ঘনীভূত অন্ধকারের মধ্যে হাস্যকৌতুকের আলো জ্বালাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলাম, কিন্তু বর্ষাকালের দেশলাই-কাঠির মতো সেগুলা ভালো করিয়া জ্বলিল না। অনেক ঘর্ষণে থাকিয়া থাকিয়া অমনি একটু একটু চমক মারিতে লাগিল। যখন সরোজিনী জাহাজ তাঁহার যাত্রীসমেত গঙ্গাগর্ভের পঙ্কিল বিশ্রামশয্যায় চতুর্বর্গ লাভ করিয়াছেন তখন খবরের কাগজে □□□ □□□□□□□□□- এর কোঠায় একটিমাত্র প্যারাগ্রাফে চারিটিমাত্র লাইনের মধ্যে কেমন সংক্ষেপে নির্বাণমুক্তি লাভ করিব সে বিষয়ে নানা কথা অনুমান করিতে লাগিলাম। এই সংবাদটি এক চামচ গরম চায়ের সহিত অতি ক্ষুদ্র একটি বটিকার মত কেমন অবাধে পাঠকদের গলা দিয়া নামিয়া যাইবে, তাহা কল্পনা

করা গেল। বন্ধুরা বর্তমান লেখকের সম্বন্ধে বলিবেন, “আহা, কত বড়ো মহদাশয় লোকটাই গেছেন গো, এমন আর হইবে না।’ এবং লেখকের পূজনীয়া ভ্রাতৃজায়া সম্বন্ধে বলিবেন, “আহা, দোষে গুণে জড়িত মানুষটা ছিল, যেমন তেমন হোক তবু তো ঘরটা জুড়ে ছিল।’ ইত্যাদি ইত্যাদি। জাঁতার মধ্য হইতে যেমন বিমল শুভ্র ময়দা পিষিয়া বাহির হইতে থাকে, তেমনি বউঠাকুরাণীর চাপা ঠোঁটজোড়ার মধ্য হইতে হাসিরাশি ভাঙিয়া বাহির হইতে লাগিল।

আকাশে তারা উঠিল, দক্ষিণে বাতাস বহিতে লাগিল। খালাসিদের নমাজ পড়া শেষ হইয়া গিয়াছে। একজন খ্যাপা খালাসি তাহার তারের যন্ত্র বাজাইয়া, এক মাথা কোঁকড়া-ঝাঁকড়া চুল নাড়াইয়া, পরমউৎসাহে গান গাহিতেছে। ছাতের উপরে বিছানায় যে যেখানে পাইলাম শুইয়া পড়িলাম; মাঝে মাঝে এক-একটি অপরিস্ফুট হাই ও সুপরিস্ফুট নাসাধ্বনি শ্রুতিগোচর হইতে লাগিল। বাক্যালাপ বন্ধ। মনে হইল যেন একটা বৃহৎ দুঃস্বপ্ন-পক্ষী আমাদের উপরে নিস্তব্ধভাবে চাপিয়া আমাদের কয়জনকে কয়টা ডিমের মতো তা দিতেছে। আমি আর থাকিতে পারিলাম না। আমার মনে হইতে লাগিল “মধুরেণ সমাপয়েৎ’। যদি এমনই হয়, কোনো সুযোগে যদি একেবারে কুষ্ঠির শেষ কোঠায় আসিয়া পড়িয়া থাকি, যদি জাহাজ ঠিক বৈতরণীর পরপারের ঘাটে গিয়াই থামে, তবে বাজনা বাজাইয়া দাও – চিত্রগুপ্তের মজলিশে হাঁড়িমুখ লইয়া যেন বেরসিকের মতো দেখিতে না হই। আর, যদি সে জায়গাটা অন্ধকারই হয় তবে এখান হইতে অন্ধকার সঙ্গে করিয়া রানীগঞ্জে কয়লা বহিয়া হইয়া যাইবার বিড়ম্বনা কেন? তবে বাজাও। আমার ভ্রাতুষ্পুত্রটি সেতারে ঝংকার দিল। ঝিনি ঝিনি ঝিন্ ঝিন্ ইমনকল্যাণ বাজিতে লাগিল।

তাহার পরদিন অনুসন্ধান করিয়া অবগত হওয়া গেল, জাহাজের এটা ওটা সেটা অনেক জিনিসেরই অভাব। সেগুলি না থাকিলেও জাহাজ চলে বটে কিন্তু যাত্রীদের আবশ্যক বুঝিয়া চলে না, নিজের খেয়ালেই চলে। কলিকাতা হইতে জাহাজের সরঞ্জাম আনিবার জন্য লোক পাঠাইতে হইল। এখন কিছুদিন এইখানেই স্থিতি।

গঙ্গার মাঝে মাঝে এক-একবার না দাঁড়াইলে গঙ্গার মাধুরী তেমন উপভোগ করা যায় না। কারণ, নদীর একটি প্রধান সৌন্দর্য গতির সৌন্দর্য। চারি দিকে মধুর চঞ্চলতা, জোয়ার-ভাঁটার আনাগোনা, তরঙ্গের উত্থান-পতন, জলের উপর ছায়ালোকের উৎসব – গঙ্গার মাঝখানে একবার স্থির হইয়া না দাঁড়াইলে এ-সব ভালো করিয়া দেখা যায় না। আর জাহাজের হাঁস্‌ফাঁসানি, আগুনের তাপ, খালাসিদের গোলমাল, মায়াবদ্ধ দানবের মতো দীপ্তনেত্র এঞ্জিনের গোঁ-ভরে সনিশ্বাস খাটুনি, দুই পাশে অবিশ্রাম আবর্তিত দুই সহস্রবার চাকার সরোষ ফেন-উদ্‌গার – এ-সকল গঙ্গার প্রতি অত্যন্ত অত্যাচার বলিয়া বোধ হয়। তাহা ছাড়া গঙ্গার সৌন্দর্য উপেক্ষা করিয়া ছুটিয়া চলা কার্যতৎপর অতিসভ্য ঊনবিংশ শতাব্দীকেই শোভা পায় কিন্তু রসজ্ঞের ইহা সহ্য হয় না। এ যেন আপিসে যাইবার সময় নাকে মুখে ভাত গোঁজা। অন্নের অপমান। যেন গঙ্গাযাত্রার একটা সংক্ষিপ্ত সংস্করণ গড়িয়া তোলা। এ যেন মহাভারতের সূচীপত্র গলাধঃকরণ করা।

আমাদের জাহাজ লৌহশৃঙ্খল গলায় বাঁধিয়া খাড়া দাঁড়াইয়া রহিল। স্রোতস্বিনী খরপ্রবাহে ভাসিয়া চলিয়াছে। কখনো তরঙ্গসংকুল, কখনো শান্ত, কোথাও সংকীর্ণ, কোথাও প্রশস্ত, কোথাও ভাঙন ধরিয়াছে – কোথাও চড়া পড়িয়াছে। এক-এক জায়গায় কূল-কিনারা দেখা যায় না। আমাদের সম্মুখে পরপার মেঘের রেখার মতো দেখা যাইতেছে। চারি দিকে জেলেডিঙি ও পাল-তোলা নৌকা। বড়ো বড়ো জাহাজ প্রাচীন পৃথিবীর বৃহদাকার সরীসৃপ জলজন্তুর মতো ভাসিয়া চলিয়াছে। এখন বেলা পড়িয়া আসিয়াছে। মেয়েরা গঙ্গার জলে গা ধুইতে আসিয়াছে, রোদ পড়িয়া আসিতেছে। বাঁশবন, খেজুরবন, আমবাগান ও ঝোপঝাপের ভিতরে ভিতরে এক-একটি গ্রাম দেখা যাইতেছে। ডাঙায় একটা বাছুর আড়ি করিয়া গ্রীবা ও লাঙ্গুল নানা ভঙ্গিতে দাঁড়াইয়া হাততালি দিতেছেন; যে চর্মখানি পরিয়া পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন তাহার বেশি পোশাক পরা আবশ্যক বিবেচনা করেন নাই। ক্রমে অন্ধকার হইয়া আসিল। তীরের কুটিরে আলো জ্বলিল। সমস্ত দিনের জাগ্রত আলস্য সমাপ্ত করিয়া রাত্রের নিদ্রায় শরীর-মন সমর্পণ করিলাম।

শ্রাবণ-ভাদ্র, অগ্রহায়ণ, ১২৯১

সূচিপত্র